দান—পাঁচ টাকা

৭০ তম বর্ষ　　পঞ্চম সংখ্যা　　ভাদ্র ১৪১৫

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার।"

[সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ হইতে প্রকাশিত সত্যসঙ্ঘের মুখপত্র]

সম্পাদক :

সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমৈত্রেয় প্রতিম বড়ুয়া

সূচীপত্র

সঙ্ঘসাথী

"সত্যমন্ত্র হে মানব কর রে গ্রহণ, সত্যই মঙ্গলপ্রসূ শান্তির কারণ।"

সপ্ততিতম বর্ষ | ভাদ্র ১৪১৫ | পঞ্চম সংখ্যা

অমরত্ব

শ্রীতারাচরণ

অমরত্ব তর্কে বুঝান যায় না। এজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়। ত্যাগের দ্বারা জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগিয়া উঠে। তখন অমরত্ব সম্বন্ধে বুঝা যায়, তখন বুঝা যায় মৃত্যুর পরপারে কি আছে। মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যুই নিশ্চিত বস্তু। মৃত্যু আছে জরা আছে ব্যাধি আছে। এ সকলের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় মৃত্যুকে স্মরণ করা। যখন লোক মৃত ব্যক্তির সহিত শ্মশানে যায়, তখন শ্মশান বৈরাগ্য আসে, এই বৈরাগ্য চিরস্থায়ী হইলে অনেক কাজ হয়। মায়া মোহ দ্বারা আমরা ভুলিয়া যাই। এই ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে নিশ্চয় আমরা ভগবানের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

সর্বধর্মসমন্বয় ও ভগবান বুদ্ধ

বন্দনা মুখার্জী

আলোচ্য রচনার বক্তব্য বিষয় হল 'সর্বধর্ম সমন্বয় ও ভগবান বুদ্ধ', অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তাৎপর্য্য। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনার সংগে 'ধর্ম' কি? এবং ধর্মের প্রকৃত অর্থ কি? তা নিয়ে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন।

'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হোলো 'ধৃ' ধাতু থেকে, 'ধ্রীয়তে লোকো হনেন ধরতী লোকং'১ - বাচস্পত্যমে ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'যাহা ধারণ করে তাহাই হোলো ধর্ম'। 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ধারণ বা পোষণ করে'। কিন্তু শব্দটির উল্লেখ ঋগ্বেদে (০১/২২/১৮) জগন্নির্বাহক নিয়ম সমূহে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের পক্ষে যা কর্তব্য ও আচরণীয় পরবর্তী কালে তাই 'ধর্ম' অর্থে প্রচলিত। সেজন্য স্বাভাবিক গুণ, নৈতিক চরিত্র অর্থে ধর্ম শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে কালগত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু মানবগোষ্ঠি বা সম্প্রদায় দ্বারা লালিত আচরণ, বিশ্বাস, উপাসনা ইত্যাদি থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি। জৈমিনী সূত্রে 'ধর্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপে।

চোদনা লক্ষনোহর্থ ধর্মঃ। 'চোদনা' মানে Inspiration. বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে— ক্ষমা, সত্য, দমঃ শোচদানমিন্দ্রিয়, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণং দয়া, আর্জব (লোভশূন্যত্বং), দেব ব্রাহ্মণপূজনম্, অলভ্যসুয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্যং উচ্চতে ইতি। ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণে ধর্মের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ভাবে দেওয়া হয়েছেঃ বিদ্যা দয়া দমঃ শৌচং সত্যমস্তেয়তা তপঃ। আবার স্মৃতিতে বলা হয়েছে—জিতেন্দ্রিয়ত্বম ক্রোধ লজ্জা ধর্মঃ ইতি স্মৃতিঃ অতএব দেখা যাচ্ছে 'ধর্ম' হলো প্রকৃত পক্ষে আচরণশীলতা। বাস্তবিক পক্ষে সব ধর্মেই মানুষের আচার আচরণের পবিত্রশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে. সেটাই হোলো আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

বৌদ্ধধর্ম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও পৃথক ধর্ম নয়। একে বলা যেতে পারে আচরণশীল হবার পদ্ধতিমাত্র রিস ডেভিড্স এর ভাষায় Buddhism, basically is not a religion. It is a way of life. Before the advent of Buddha, there was one great religion in India i. e. Sanatana dharma. Due to some differences of opinion between the followers of Hinduism Buddha preached his own 'ism' i.e. 'Buddhism'2

এই প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি যেটি তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খ্রীঃ চিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনের ষোড়শতম বক্তব্যে বলেছিলেন 'শাক্যমুনি' (অর্থাৎ বুদ্ধদেব) হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পূর্বে ভারতবর্ষে একটিই ধর্ম্ম ছিল। সেটি হোলো 'সনাতন ধর্ম'।' হিন্দুগণ শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বুদ্ধদেবের

প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমি তাহাই দেখাইতে চাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি : শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি, যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ও ন্যায় সঙ্গত বিকাশ'।

সুতরাং বলা যেতে পারে কতকগুলো মত পার্থক্যের জন্যই (আত্মার অস্তিত্ব, অনিত্যতা ইত্যাদি) বুদ্ধদেব যে সত্য মত প্রচার করেন তা-ই হোলো বৌদ্ধধর্ম'। সেটাই হোলো আচরণ ধর্ম'। আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় গৌতম বুদ্ধ বেদ ব্রাহ্মণের বিরোধী এবং তিনি নিরীশ্বরবাদী। এই নিন্দার মুকুট মাথায় নিয়েই সাম্যবাদী বুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক বিধি ও বিধান, ধর্ম্মাদর্শ ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর আনয়ন করেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য 'আনন্দ' বুদ্ধের পরিনির্বাণের আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন "ভগবান, আপনার পর সঙ্ঘের দায় ভার কে নেবেন?' উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন—"ধর্ম্মবিনয়ের অনুশাসন" পালি ভাষায় বলা যেতে পারে—'বিনয় বুদ্ধ সাসনস্স আয়ু। বিনয়ঠিতে সাসনম্ ঠিতো হোতি।' অর্থাৎ বিনয় বৌদ্ধ শাসনের আয়ু। বিনয় থাকলেই বৌদ্ধ শাসন থাকবে। এখন প্রশ্ন হোলো---বিনয় কি? 'বিনয়' শব্দের অর্থ হোলো—যা মানুষের মন সংযত করে। এই 'সংযম' এবং 'সংযত আচরণ'ই হোলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা। যেটা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী দরকারী।

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে এখানে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সুপ্রাচীন কাল থেকে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতক) আজ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বিকাশে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মন ও চিত্তের স্বচ্ছন্দ মিলনের সুষ্ঠু পথনির্দ্দেশে ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী কতটা সহায়ক হতে পারে তা প্রণিধান যোগ্য। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে পার্থিব জীবনে মানুষের মৌলিক-চাহিদাগুলো হলো নিম্নরূপ :

১) বাঁচার অধিকার—অর্থাৎ জীব মাত্রেই বাঁচতে চায়। এটা তার জন্মগত অধিকার।

২) কোনও ব্যক্তিই চায় না তার প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি বলপূর্বক বা বে-আইনিভাবে গ্রহণ করুক।

৩) কেউই তার পরিবারে যৌন দুর্নীতি পছন্দ করে না।

৪) মিথ্যাবাদী মানুষকে কেউ পছন্দ করে না।

৫) মানুষ নিজের স্বাস্থ্য, ধন, সম্পদ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেশা বা মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে হারাতে চায় না।

এই চাহিদাগুলোর পূর্ণতা সাধনে ভগবান বুদ্ধ নির্দ্দেশিত পঞ্চশীল এক অভিনব সংযোজন। অতএব প্রকৃত মানুষ হবার জন্য নিম্নলিখিত শীলগুলি পালন করা একান্ত দরকার :

১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হওয়া (পানাতি-পাত বেরমনী)

২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা (অদিন্নদান বেরমনী)

৩) ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকা (কামেসু মিচ্ছাচার বেরমনী)

৪) মিথ্যাবাক্য পরিহার (মুসাবাদ বেরমনী)

৫) সুরা-মৈরয় ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ বস্তু থেকে বিরত থাকাই হল পঞ্চশীল। [সুরা মেরয়মজ্জপ্পমাদট্ঠান বেরমনী]

চিত্তের প্রসারতা, হৃদয়ের পবিত্রতা, বিশ্বের সকল প্রাণীর কল্যাণ চিন্তা এবং মানুষের একান্ত সৌহার্দের উপর এই পঞ্চশীলের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিগত জীবনে এই শীলগুলি অনুশীলন করলে অন্যের স্বাধীনতাও ক্ষুন্ন হয় না, অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম-ভালবাসা ও সৌহার্দের সম্পর্ক হয়। ভগবান বুদ্ধের এই পঞ্চশীলের শিক্ষাপদ অনুসরণ করার নির্দেশ গৃহী ও ভিক্ষু উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও তিনি দীঘানিকায়ের (Digha Nikaya) এর সিগালোবাদা সুত্রেও (Sigalovada Sutta) গৃহীদের জন্য দশশীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দশশীলে উপরিউক্ত ৫টি শীল ছাড়াও আরও ৫টি শীলের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হোলো:

৬) পিশুনবাচা বেরমনী—অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি কারী কথা বলব না।

৭) ফরুসবাচা বেরমনী—কর্কশ বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রত্যেক মানুষ আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চায়। সে অন্য সকলের মত সমান সুযোগ সুবিধা পেতে চায়। এ ক্ষেত্রে অন্য দ্বারা সৃষ্ট মানসিক পীড়ন কোনও মানুষ পছন্দ করে না।

৮) অভিজ্ঝায় বেরমনী—অর্থাৎ পর সম্পত্তিতে লোভ করব না।

৯) ব্যাপাদায় বেরমনী—অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করব না।

১০) মিচ্ছাদিঠ্ঠিয়া বেরমনী—মিথ্যাদৃষ্টি(অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফল নেই - এই ভুল ধারণা) থেকে বিরত থাকব।

সমস্ত গৃহী এবং বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সকাল ও সন্ধ্যায় পঞ্চশীল ও দশশীল গ্রহণ করে প্রতিপালন করা কর্তব্য। বিশ্বশান্তির বীজ এই শীলেই নিহিত আছে। শীলবান ব্যক্তিগণ জগতে দ্বন্দ্বহীন মৈত্রী রাজ্য স্থাপন করতে পারেন।

ভগবান বুদ্ধ জাতি বিচার নির্ভর চিন্তাধারা, সংস্কার, মূঢ় প্রথা, জাতিভেদ এবং আচারগত সংকীর্ণতার নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে জন্মগত ভাবে কেউ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা শূদ্র নন। কেবল মাত্র কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন সম্ভব। ধম্মপদের ভাষায়:-

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যমহি সচ্চং চ ধম্মোচ সোচ সুচি সো চ ব্রাহ্মণো
(ধম্মপদ সূত্র সংখ্যা ৩৯৩)

আর এক জায়গায় তিনি ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—বাহিত পাপ'তি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি পাপমুক্ত এবং সংযমী তিনিই ব্রাহ্মণ। 'আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলব যিনি কায়, মন এবং বাক্যে কোনও পাপ কর্ম্ম করেন না এবং যিনি এই তিনটি স্থানে সংযত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নথি দুক্কতং
সংবুতং তিহি ঠানেহি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং
(ধম্মপদ সূত্র সংখ্যা ৩৯১)

ভগবান বুদ্ধ অধ্যাত্ম চিন্তনে তাঁর সংঘে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। হীন, অস্পৃশ্য জাতির মধ্য থেকেও তাঁহার সংঘের ভিক্ষুত্ব লাভ করিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উপালি যিনি বিনয়ধর ছিলেন অর্থাৎ বিনয়ের অবতারণা করেন তিনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। থেরগাথায় সুনীত থের তাঁর নিজের জীবনী যা বলেছেন তা হোলো নিম্নরূপ—

"নীচকুলে আমার জন্ম, আমি দীন-দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, মন্দিরের শুষ্ক ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা এই আমার কাজ। লোকে আমাকে হেয়জ্ঞান করিত, আমি বড়লোকের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইতাম। ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সহ মগধের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনলাভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলাম। আমায় দেখিয়া তিনি কৃপালু হইয়া ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইলেন। রাজাধিরাজ তুল্য কোথায় সেই ভগবান বুদ্ধ, আর কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চন। আমার নিবেদন শুনিবার জন্য থাকিলেন। আমি প্রভুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম, প্রভু এই অধীনকে আপনার ভিক্ষুদলে গ্রহণ করুন। তখন পরম কৃপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন - হে ভিক্ষু এস - আমার সঙ্গে চল। এই আমার একমাত্র দীক্ষা।" বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "সদাচার, শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হয় ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই।" বুদ্ধদেব মাতঙ্গের (আর একজন শিষ্য) গল্পে বলেছেন - 'মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ ধর্ম্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না জন্মিয়াই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না - নিজ কর্মগুণেই ব্রাহ্মণ - নিজ কর্মদোষেই চণ্ডাল।" (সুত্তনিপাত)

বুদ্ধ শিষ্যা আম্রপালি পেশায় গণিকা ছিলেন। এছাড়া কিসাগৌতমী, পুন্নাদাসী ইত্যাদী আরও কত শিষ্যা এবং শিষ্য বুদ্ধের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন যাঁরা তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণের ছিলেন না। তাঁর মতে মানুষ কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেই পরম মঙ্গলের পথযাত্রী হতে পারে। আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাড়া মনুষ্যত্বের সাবলীল বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই নিজের নিয়ামক। নিজেই নিজের অবলম্বন হয়ে উঠুক এটাই তাঁর কাম্য। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে 'অত্তদীপ ভব' নিজেই নিজের প্রদীপ হও, মহাপরিনির্বাণ সুত্তে দেখা যায় বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেছেন—

অত্তদীপ ভব। অত্তদীপা বিহরথ। অত্তসরনা অনঞ্ঞসরনা। ধর্ম্মদীপা ধর্মসরনা অনঞ্ঞসরনা

ধম্মপদের ভাষায়ঃ

অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া;
অত্তনো হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং
(ধম্মপদ সু স ১৬০)

শীল পালন ছাড়া ভগবান বুদ্ধের আরও একটি মূল্যবান উপদেশ হল—চতুর্ব্রহ্মবিহার পালন। এই চতুর্ব্রহ্মবিহার হলঃ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। পরম কারুণিক বুদ্ধের অপরিমিত মৈত্রী ও করুণার নির্দেশ আজকের সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন 'জীবমাত্রেই করুণা ও মৈত্রীর যোগ্য, কোনও জীবই ঘৃণার পাত্র নহে। সুতরাং সকলের প্রতিই সমান মৈত্রী প্রসারিত করতে হবে।'

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিন মনসাম ভাবয়ে অপরিমানম
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসংবাদনং অসপত্তম্।
[মেত্তাসুত্ত]

সমস্ত জগতের উর্দ্ধে, নিম্নে এবং চতুর্দিকে যত প্রাণী আছে সকলে বাধাহীন, বৈরীহীন ও অপ্রতিদ্বন্দী হোক—চিত্তে এরূপ মৈত্রীভাব পোষণ করবে। এই ভাবনার দ্বারা মনকে ব্যাপ্ত রাখলে সকল মানুষই পরস্পরের প্রতি হিংসা, গ্লানি ও বিদ্বেষ হতে মুক্ত হতে পারবে।

করুণা : করুণা বলতে ভগবান বুদ্ধ সর্ব প্রাণীর স্তরে করুণার কথা বলেছেন। সেখানে মানুষ, পশু, পাখী, গাছপালার কোনও ভেদাভেদ নেই। বিনয় পিটকে উল্লিখিত আছে যে কোনও ভিক্ষু যদি একমুঠো ঘাসও ছেঁড়ে বা গাছের ডাল বা পাতা কাটে তবে সে পারাজিক দোষযুক্ত হয় এবং সংঘ তাকে শাস্তি প্রদান করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে তিনমাস বর্ষাবাস থাকে তখন তাঁরা ঘরের বাহিরে বার হন না। মাটিতে চংক্রমণ ধ্যান করেন না। তার কারণ হল বর্ষাকালে মাটিতে কেঁচো ইত্যাদি অনেক রকম পোকা মাকড় ওঠে। চংক্রমণের ফলে তারা পদপিষ্ট হয়ে মারা যেতে পারে। ভিক্ষুদের প্রতি ভগবান বুদ্ধের এরূপ নির্দেশের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে যেটা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, আবার প্রাণী জগতের প্রতি করুণারও নির্দেশ করে। করুণা, ভালবাসা এবং মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ ও শত্রুদের জয় করাই বুদ্ধের উপদেশ। তিনি বলেছেন ক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। ঘৃণার দ্বারা শত্রুকে দমন করা যায় না। কেবলমাত্র মৈত্রী, প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাই ক্রোধের জয় হয়। এটাই সনাতন ধর্ম। ধর্মপদের ভাষায় :

নহি বেরেন বেরানি সম্মতীধকুদাচনং
আবেরেন চ সম্মতি এস ধম্মোসনন্তনো
(ধম্মপদ সু স ৫)

সুতরাং অবৈরীতার দ্বারা বৈরী ভাবকে জয় করতে হবে।

মুদিতা : মানুষ তার সুখ ও শান্তিপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল জীবনের প্রতি অপরের ঈর্ষা পছন্দ করে না। অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং অন্যের সুখে সুখী হওয়াই মুদিতা ভাবনার লক্ষবস্তু। মুদিতা ভাবনায় পরস্পরের প্রতি হিংসা, গ্লানি ও বিদ্বেষ মুক্ত হবার জাদুকরী শক্তি নিহিত আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপেক্ষা : এই তিনটি ভাবনার (মৈত্রী করুণা, মুদিতা) পর আসে উপেক্ষা ভাবনা। (practice of equanimity)। এটা হচ্ছে শত্রু-মিত্র ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল চিন্তা করা এবং নির্লিপ্ত ভাবে সৎকার্য্য করা। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন প্রত্যেককে ভাবতে হবে—অহং অবেরো হোমি, অব্যাপাজ্জো হোমি, অনিসো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহয়ন্ত দুঃখ মুক্তঞ্চ যথালব্ধ সম্পতিতো মা বিগচ্ছন্ত কম্মসকা। (ধম্মপদ)

প্রতিদিন ভাবতে হবে (জাতি ধর্ম নির্বিশেষে) সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখীমনা হয়ে দিনযাপন করুক, যথাযলব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক উদার মৈত্রী ভাব ও পারস্পরিক অন্তরঙ্গ ঐক্যবোধ প্রসারিত করা হোলো বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমস্ত

মানুষের জন্য সৎ কর্ম্মের এবং মহৎ ও আবশ্যকীয় জীবিকার নির্দেশ রয়েছে বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে। এই প্রসঙ্গে তিনি আটটি নৈতিক বিধানের কথা বলেছেন। সেগুলো হোলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংলাপ, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। তিনি বলেছেন মানুষের জীবিকা হবে সম্যক এবং কাজও হবে সম্যক। "যা সম্যক কর্ম তার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পরিসমাপ্তিতেও কল্যাণ। সে কাজ হবে বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য, দেবমনুষ্যের কল্যাণের জন্য"। তিনি তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেন—

'চরথ ভিক্ষবে চারিকম্ বহু জন হিতায়
বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়, অথায় হিতায়
সুখায় দেবমনুস্স্যানং'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আজকের বিশ্বে যে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সেই পাপদগ্ধ, হিংসাস্নাত মানুষের আকণ্ঠ প্রাণ পিপাসায় শান্তির অমিয়ধারা ঝরিয়ে দিতে সহায়ক হতে পারে বুদ্ধের বিশ্ব মৈত্রীর বাণী। আজ থেকে ২০০০ বছরেরও বেশী আগে যে বাণী উত্থিত হয়েছিল নৈরঞ্জনা নদীর তীরে রাজগীরে, বারানসীতে—ব্যাপ্ত হয়েছিল দেশ দেশান্তরে সে বাণী মৈত্রীর, আত্মবিশ্বাসের আনন্দের, বিশ্বমানবের সংঘ চেতনার। ভারতে সুচিত হোলো বিশ্বের সর্বপ্রথম ও বৃহত্তম ধর্মবিপ্লব। বিশ্বে প্রবর্তিত হোলো সভ্যতার সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা—

"সব্ব পাপসস্ অকরনম্ কুসলস্স উপসম্পদা সচিত্ত পরিয়োদনং—এতং বুদ্ধানুসাসনং।" যাকে আজকের যুগে কারলাইল বলেছেন—"You please be honest you will see one rascal is less from the world"

বুদ্ধ বলেছেন প্রতিদিন ভাবতে হবে সকল প্রাণী সুখী হোক। শত্রুহীন হোক। অহিংসিত হোক। সুখীমনা হয়ে দিন যাপন করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ ধন ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত না হোক। তাই অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। অবৈরীতার বৈরী ভাবকে জয় করবে। শত্রুতার ও প্রেমের দ্বারাই শত্রুকে জয় করবে। এটি আজকের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা এবং শান্তির পথ।

সমস্ত মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মৈত্রীকে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যে :

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তংঅনুরকথে
এবং পি সব্বভুতেসু মনসা ভাবয়ে অপরিমানং।

"মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, জগতের সমস্ত প্রাণীকে সেই প্রকার অপরিমিত মৈত্রীর দ্বারা রক্ষা করবে।" এই উপমাটি বর্তমান জগতে এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত তাৎপূর্ণ।

তাই বুদ্ধ পরিকল্পিত অহিংসা কেবল একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা নয়, তার থেকে অনেক বেশী। এখানে অহিংসা অর্থে শুধু হিংসা থেকে বিরত থাকা নয়, প্রীতি বহন করা ও কল্যাণ চিন্তা করাও বোঝায়। নিজের স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করাই হোল ভগবান বুদ্ধের উপদেশ।

ভগবান বুদ্ধ নির্দেশিত এই চতুর্ব্রহ্ম বিহারের ভাবনা অর্থাৎ 'মেত্তা করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা' ভাবনার প্রভাব সেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী কালেও বুদ্ধানুগামীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চিকাগো শহরের যে মহাধর্ম্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের পৃথিবীর সব দেশ থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুধর্মের কোনও প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত মহিমা এবং রূপ প্রকাশের ইচ্ছায় সেখানে অনিমন্ত্রিত ভাবে যান। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্মপাল নিজের বক্তব্যের জন্য সীমিত এবং নির্ধারিত সময় থেকে ৫ মিনিট সময় স্বামীজিকে দেন। অনাগরিক ধর্মপালের এই বদান্যতা এবং বৌদ্ধ ধর্মের এই উদার মনোভাবের কথা তাঁর রচনাবলীতে স্বামীজি নানান ভাবে উল্লেখ করেছেন। স্বামীজি নিজের লেখায় ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত মতের নানান প্রশংসাও করেছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে আজ হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বের কিছু মানুষ পতঙ্গের মত নিজেও মরছে, বিশ্বেও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। যেটা প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম' শব্দের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথায়:

স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত,
লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে
লজ্জা শরম তেয়াগী জাতি প্রেম নাম ধরি প্রাণ্ড
অন্যায়
ধর্মের ভাষাতে চাহে প্রবল বন্যায়
করিদল চিৎকারিছে জাগাইছে ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

গোটা বিশ্বই এখন যেন রণভূমিতে পরিণত। হিংসায় মত্ত সন্ত্রাস মত্ত, মানুষকে রুখবার কৌশল হিসাবে পাল্টা সন্ত্রাসের পথে টানছে অনেকে —নিঃসন্দেহে তাহা ভ্রান্ত পথ। সুতরাং দেখা উচিত কি প্রয়োজন এসব ঘটছে তার কার্যকারণ অনুধাবন করা। এই কার্য্য - কারণ দর্শনটি গড়ে উঠেছে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। যার অর্থ হোলো একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। বিনা কারণে কোনও কার্যই হয় না। পালিতে তার ব্যাখ্যা হয়েছে—

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি
ইমসস্ উপ্পাদা ইদং নিরুজ্ঝতি।

অর্থাৎ এই হতে এই হয়। এর উৎপত্তি হতে এর উৎপত্তি। এক দিকে যা কারণ তাই অপর দিকে কার্য্য। এই কার্য্য - কারণ পরম্পরা সংযোগে নির্মিত হয় এক চক্র। তাই আশা করি বুদ্ধের শান্তিবাদ ও সঙ্ঘের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আবার বিশ্বকে নতুন করে আলো দেখাবে এবং বিশ্বকে পরিত্রাণের পথ করে দেবে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হোসেনুর রহমান এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি "আমাদের দেশে গৌতম বুদ্ধ প্রেম ও করুণা দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন বাস্তবে পরিণত করে গেলেন। বর্ণ বিদ্বেষের মত সামাজিক ব্যাধিকে চূড়ান্ত আঘাত হানলেন। মানুষের যুগ যুগান্ত সঞ্চিত হিংসা-বৃত্তিকে দূর করলেন প্রেম ও শান্তি দিয়ে।

উল্লেখ পঞ্জী / সূত্র ঃ

১। বিশ্বকোষ - ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১০ - ৩১১

২। রিস্ ডেভিড্স্ - বুদ্ধিজম (Buddhism)

৩। স্বামী বিবেকানন্দ - চিকাগো বক্তৃতামালা, পৃঃ ৪৪

৪। ধম্মপদ

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

অনিল চন্দ্র দত্ত (প্রয়াত)

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য হচ্ছে শ্বাস। এই শ্বাস জীবের শরীরে ও শরীর থেকে বাহিরে যাওয়া আসা করে। শ্বাসবিহীন্ শরীর একটি জড়পিণ্ড বিশেষ; কিন্তু প্রাণ ক্রিয়ার ফলে এই জড়ের মধ্যেই চৈতন্যময়তা স্পন্দিত হয়। জীব সাধারণতঃ আপন প্রাণকে ভালবাসে। প্রাণের ঈশ্বররূপ মহিমা যে বিদ্যমান, তাহা অনুভব করতে হবে এবং এটাই একমাত্র সত্যপথ। ঈশ্বরকে যতদিন প্রাণরূপে বুঝতে না পারা যায়, ততদিন ঈশ্বর পরই থাকেন। ঈশ্বর চৈতন্য ও প্রাণ একই। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই ইহা চৈতন্যময় থাকে। শরীরে প্রাণ না থাকলে, শরীর জড় শরীরে পরিণত হয়। প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষ সহজেই চৈতন্যের সন্ধান পেতে পারে। প্রাণের মাধ্যমেই মানুষ কথা বলে, মন্ত্র জপ করে এবং স্তোত্রাদি পাঠ করে। মানুষ যদি প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে তাহার উচ্চারিত মন্ত্র চৈতন্যময় হ'বে। ইহাই "মন্ত্রচৈতন্য"। মানুষ যখন "প্রাণ-গোবিন্দ", "প্রাণ-কৃষ্ণ" ও "প্রাণ-হরি" বলে মধুময় নাম করে এবং "প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ বলে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে, তখন মানুষের সেই "প্রাণ-গোবিন্দ", "প্রাণ-কৃষ্ণ" ও "প্রাণ-হরি", যাহারা প্রাণরূপে মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে মানুষকে জীবিত রেখেছেন, তাহারাই মানুষের কণ্ঠ থেকে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহারাই ত' প্রাণ। মানুষ যদি মনকে স্থির রেখে' প্রাণময় নাম করে, তাহলে সেই নাম চৈতন্যময় হয়ে উঠবে এবং তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে নামের সঙ্গে শ্রীহরি বিদ্যমান্ আছেন।

নাম ও নামী একই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রাণময় নাম করেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রাণ স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ বস্তু। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ই প্রাণেরই বিভিন্ন শক্তি প্রবাহ মাত্র। প্রাণ ও শক্তি একই। এই জগতে সাধারণ দৃষ্টিতে দুইটি বস্তু পরিলক্ষিত হয় যথা জড় বস্তু

এবং জড় বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রাণ বা শক্তি। উপনিষদ উক্ত দুইটি বস্তুকে প্রাণ ও রয়ি বলে উল্লেখ করেছে। এই দুইটি বস্তুই বিশ্বের মূল উপাদান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাণ ও রয়ি এই দুইটিই একটি মাত্র শক্তি যাহা প্রাণ ও রয়িরূপে এবং জড় ও চৈতন্যরূপে অনন্ত বৈচিত্রময় এই জগৎলীলা সম্পাদন করছে এবং এই শক্তিই প্রাণ যাহা উপনিষদে বর্ণিত আছে। প্র পূর্বক অন্ ধাতু থেকে প্রাণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অন্ ধাতুর অর্থ রক্ষা। যিনি বিশ্বকে রক্ষা করেন, তিনিই প্রাণ। ঈশ্বরই বিশ্বকে রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকেই প্রাণ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

॥ হিন্দী থেকে অনুবাদ ॥

॥ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না ॥

মূল হিন্দী লেখক—ডঃ দীনানাথ ঝা 'দিনকর'

বাংলা অনুবাদ—**শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ**

[হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'; কোলকাতা, রবিবার, ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাল।]

এই পৃথিবীতে সাধারণতঃ প্রতিটি ঘটনাই ঘটে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ অনুসারে। প্রতি ঘটনার পিছনেই থাকে নিয়মশৃঙ্খলা। আবার ব্যতিক্রমও থাকে জগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই। এই ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলিকে বলা হয়ে থাকে 'অদ্ভুত ঘটনা'। আর্নার কোমলর এলন ওয়ান, রিচার্ড বোক্ ষ্টিওয়েল আদি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মানুষ এই ধরণের কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে। ঐ সব গ্রন্থে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে।

বহু বছর আগে—ফিলিপ নামক এক ব্যক্তি এক মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হল। ঐ দুর্ঘটনায় তাঁর ডান দিকের ফুসফুসের অনেকটা ভিতরের দিকে একটি গুলি ঢুকে যায়। সেই সময়ে অপারেশনের যন্ত্রপাতি বিশেষ উন্নত ছিল না বলে চিকিৎসকগণ ফিলিপের শরীর থেকে গুলিটি বার করে দিতে পারলেন না। গুরুতর জখম অবস্থায় ফিলিপ বহুদিন ধরে হাসপাতালেই পড়ে রইলেন। একদিন তাঁর প্রচণ্ড জোরে কাশি এল এবং কাশির দমকে ঐ গুলিটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে ভাবলেন—এটা কেমন করে হতে পারে। তাঁরা এমন ঘটনা এর আগে কখনও দেখেন নি।

সুখ্যাত লেখক এলন বোন্ তাঁর 'ইনক্রেডিবল কোইনসিডেন্স' নামক গ্রন্থে এক অদ্ভূত ঘটনার কথা লিখেছেন সেটি এই রকম—

কোগলান নামক এক ব্যক্তি প্রিন্স এডওয়ার্ড নামক এক দ্বীপে বাস করতেন। এটি ১৮৯৯ সালের ঘটনা। আবার এই কোগলান আমেরিকার টেকশাস্-এর গাল ওয়েষ্টন নামক স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ওয়েষ্টন-এই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

তাঁর কফিনের উপর ছিল সীমের আস্তরণ। কোগলানের মৃত্যুর বছরেই ঐ গাল ওয়েষ্টন-দ্বীপে একবার ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টিতে কোগলানের কবরটি জলে ডুবে গিয়েছিল। এটি হলো ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। দেখা গেল যে, কোগলানের কফিনটি জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে কবর খানা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং মেক্সিকোর খাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। সেখান থেকে ঐ কফিন এসে পড়ল ফ্লোরিডায়; তারপর গেল আটলান্টিক মহাসাগরে। জলে ভাসতে ভাসতে ঐ কফিনটি ক্রমশঃ আরও উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আট বছর বাদে— ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে কোগলান-এর আদি বাসস্থান প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের কয়েকজন ধীবর দেখতে পেল যে, ঝড় তুফানে উথাল পাথাল সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ এর ধাক্কায় তটভূমির দিকে এগিয়ে আসছে একটি কফিন। তারা বাক্সটিকে তীরে এনে তা খুলে ফেলল। তারা দেখল যে, ঐ কফিনের ভিতর শায়িত শবদেহের উপর নাম লেখা আছে 'কোগলান'। ঐ ধীবররা সঙ্গে সঙ্গে কোগলানকে কে চিনতে পারল। কারণ এই সমুদ্রতটটি কোগলানের নিজ গ্রামের কাছেই ছিল। সেই গ্রামটি ছিল ঐ প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপেই। মৎসজীবীরা কোগলানের শবদেহটি তার নিজ গ্রামে নিয়ে গিয়ে সেখানেই কবরস্থ করল।

এইভাবে—কোগলান জীবিত অবস্থায় না পারলেও—অন্ততঃ মৃত অবস্থাতে ও তার নিজ গ্রামে ফিরে এল। অদ্ভুতভাবে; প্রকৃতির সহায়তায়। এরকম আশ্চর্য্য ঘটনা পৃথিবীতে বোধ হয় ঐ একবারই ঘটেছে।

আর একটি ঘটনা। মেরী গোইলেন্ট নামে একটি জায়গা আছে। সেই জায়গার ফরাসী গভর্ণর তাঁর তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে এক সমুদ্র-যাত্রায় গিয়েছিলেন। জাহাজেই মেয়েটি মারা যায়। তখন তার শবদেহটি সমুদ্র জলে ফেলে দেবার প্রস্তুতি হিসেবে একটি বস্তার ভিতরে রাখা হলো। বস্তার মুখ সেলাই করে দেওয়া হলো। ঐ জাহাজে একটি পোষা বিড়াল ছিল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল যে, ঐ বিড়ালটি বস্তার আশে পাশে ঘুরঘুর করছে এবং মাঝে মাঝে সেটি শুঁকছে। তা দেখে সকলের মনে খটকা লাগল; কারণ প্রচলিত ধারণা অনুসারে—বিড়ালরা সবসময়েই মৃতদেহের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। ব্যাপারটি কি তা বোঝার জন্য বস্তার মুখ খোলা হলো। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে, মেয়েটি বেঁচে আছে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। তখন মেয়েটির চিকিৎসা শুরু হলো এবং সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল। অদ্ভুত ঘটনা এই যে। একটি দুর্বল শিশু এক মুখ সেলাই করা বস্তার ভিতরে চব্বিশ ঘণ্টা থেকেও বেঁচে গেল। পরবর্তী কালে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই এর সঙ্গে এই মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল। মেয়েটি বিরানব্বই বছর বয়স পর্য্যন্ত বেঁচেছিল।

১৯৭৩ সালে এই পৃথিবীতেই আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। আমেরিকার ফয়েল মাউথ নামক স্থানের অধিবাসী এডুইন রবিনসন দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল এক মর্মান্তিক

পথ - দুর্ঘটনায়। চিকিৎসক ডঃ উইলিয়ম টেলর তার চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, তার পক্ষে হারানো দৃষ্টি ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, বাকি জীবনটা তাকে অন্ধ হয়েই কাটাতে হবে। এরপর রবিনসন একাই আন্দাজে এদিক ওদিক যাতায়াত করত। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে সে একদিন একাকী কোথায় যেন গিয়েছিল। সে যখন ঘরে ফিরছিল—সেই সময়ে হঠাৎ ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। রবিনসন-এর হাতে একটি শক্ত ধাতব ছড়ি ছিল। সে ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল—কোথাও কোন বড় গাছ আছে কিনা; তাহলে সে ঐ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো এবং কাছেই খুব জোর শব্দ করে বজ্রপাত হলো। সেই শব্দের আকস্মিক ধাক্কায় রবিনসন দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সে যখন উঠে দাঁড়ালো, —তখন দেখল যে, তার শ্রবণ - সহায়ক যন্ত্রটি কোথায় যেন ছিটকে চলে গেছে। রবিনসন ঐ যন্ত্রের সহায়তা ছাড়া শুনতে পেতো না। এরপর সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে, সে এখন ঐ যন্ত্রটির সাহায্য ছাড়াই সব কিছু শুনতে পাচ্ছে। আবার সব কিছু দেখতেও পাচ্ছে। সে যেন নতুন জীবন পেল। সে খুব খুশী হয়ে বাড়ী ফিরল।

বিপুল অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসকগণও এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

অদ্ভুত ঘটনা আরও আছে। একবার বিহার জেলার দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে দেওঘরে গিয়েছিল শিবের মাথায় জল ঢালতে। সেই সময়ে তারা সুলতানগঞ্জ থেকে জল নিয়ে দেওঘরের দিকে যাচ্ছিল। প্রায় দশ কিলোমিটার যাবার পর মেয়ে আর চলতে পারল না। তার মাথা ঘুরতে লাগল। তখন তারা রাস্তার ধারের একটি বাড়ীতে গিয়ে সেই বাড়ীতে কিছুক্ষণ থাকার জন্য গৃহস্বামিনীর অনুমতি চাইল। পথিক মেয়েটিকে গুরুতর অসুস্থ দেখে গৃহিণী তাকে শুইয়ে দিলেন এবং স্থানীয় এক চিকিৎসককে ফোন করলেন। চিকিৎসক নিজের কম্পাউণ্ডারকে নিয়ে সেই গৃহে এলেন। তখন দেখা গেল যে, ঐ কম্পাউণ্ডারই ঐ অসুস্থ মেয়েটির স্বামী। ঐ স্বামীটি পাঁচ বছর আগে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল। সেই দ্বিতীয় স্ত্রীটি কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। এবার কম্পাউণ্ডার সাগ্রহে তার এই প্রথম স্ত্রীকে নিজ গৃহে নিয়ে যেতে চাইল। স্বামী-স্ত্রীর এই মিলনকে সেখানে উপস্থিত সকলে বৈদ্যনাথ ধামের ভগবান রাবণেশ্বর-এর প্রসাদ বলে মেনে নিল। ওদের জীবনে কল্যাণ এলো; তবে সেটি কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে। নয় কি?

"চরিত্র সুন্দর হয় সত্যের আলোতে।
চরিত্রই শ্রেষ্ঠ ধন মানব জগতে॥"

—শ্রীতারাচরণ

শ্রীমদ্ - ভাগবতসার

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দশম স্কন্ধ ॥ প্রথম অধ্যায়

দেবকী, বাসুদেব, কংস

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, —চন্দ্রবংশ - সূর্য বংশের নরপতিগণের কথা আমরা শুনেছি। এখন যদুবংশে অবতীর্ণ বলদেব ও বিষ্ণুর পরম অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করুন। আমি শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল, আমাকে বিস্তৃত বর্ণনা করে শোনান। আপনার মুখকমল নিঃসৃত হরিকথামৃত পান করে আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাই।

সূত বললেন,—হে ভৃগুনন্দন শৌনক, পরম ভাগবত ব্যাসনন্দন শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে কলিকলুষনাশন পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বলতে আরম্ভ করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন,—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ কথায় তোমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছে, তাতেই প্রমাণিত, তোমার বুদ্ধি স্থির হয়েছে। কৃষ্ণকথা প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই পবিত্র করেন। পৃথিবী রাজরূপধারী দৈত্যদের ভারে আক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মাকে দুঃখ জানিয়েছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধরে সজল নয়নে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা সব কথা শুনে ত্রিলোচন, দেবগণ ও গোরূপা ধরণীর সঙ্গে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত দ্বারা জগন্নাথ পরম-পুরুষের উপাসনা করলেন। বিধাতা আকাশবাণী শুনে দেবগণকে বললেন,—ভগবান হরি আমাদের নিবেদন আগেই সব জেনে গেছেন। পরমেশ্বর মর্ত্যলোকে প্রকটিত হবেন, তোমরা নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। পরমপুরুষ স্বয়ং বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর প্রীতির জন্য দেব পত্নীগণও মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করুন। বাসুদেবের অংশ, সহস্রবদন, স্বরাট অনন্ত বলদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে আবির্ভূত হবেন। ভগবতী বৈষ্ণবী মায়া জগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছেন, তিনি প্রভুর আদেশে দেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ কংস-সোহনাদি বিষ্ণুর কাজের জন্য সম্ভূত হবেন।—ব্রহ্মা দেবগণকে এই আদেশ করে ধরণীকে আশ্বাস দিয়ে নিজধাম মর্ত্যলোকে চলে গেলেন।

পূর্বকালে যদুপতি শূরসেন মথুরায় বাস করে মথুরা ও শূরসেন প্রদেশ শাসন করেন। সেই থেকেই মথুরাপুরী সমস্ত যাদব-রাজাদের রাজধানী হয়ে আসছে। একদা শূরবংশীয় বসুদেব মথুরাপুরীতে দেবকীকে বিয়ে করে সস্ত্রীক যাওয়ার জন্য রথে উঠে বসলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস নিজেই বোনকে পৌঁছে দেবেন বলে রথের রজ্জু ধরে বসেছিলেন। চারদিকে অসংখ্য সুরম্য স্বর্ণখচিত রথ পরিবৃত ছিল। দেবক কন্যা দেবকীকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি জামাতা ও কন্যার গমন কালে বহু অলঙ্কৃত হাতি, ঘোড়া, রথ, দামী উপহার দিয়েছিলেন হঠাৎ আকাশবাণী হল,—মূর্খ কংস, তুমি যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ তাঁর অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করবে। পাপিষ্ঠ কংস তখনই এক হাতে দেবকীর চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে

খড়্গ নিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তখন বসুদেব বললেন, —হে বীর, তুমি বংশের গৌরব, বিয়ের উৎসবের মধ্যেই তুমি কখনো তোমার বোনকে হত্যা করতে পার? আজই হোক, একশো বছর পরেই, জন্মালে মরতে হবেই। এই দেহ শেষ হলে কর্মানুযায়ী আবার দেহ ধারণ করতে হয়। জন্ম ও মৃত্যু দেহের, দেহীর নয়। যে লোক সুখে থাকতে চায় সে কখনও অন্যকে হিংসা করবে না। হিংসা করলে হিংসাই পাবে, অন্যেও তাকে হিংসা করবে। তোমার ছোট বোন, তোমার স্নেহপাত্রী, বিনা অপরাধে এই কল্যাণী দেবকীকে বধ করা তোমার উচিত নয়।

বসুদেব ভাবলেন, বিধাতার ইচ্ছা কারো খণ্ডন করবার অধিকার নেই। বসুদেব কংসকে বললেন, —হে সৌম্য, দৈববাণী বলেছে—দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে মারবে। দেবকী তো তোমাকে মারবে না। আমি দেবকীর সমস্ত পুত্র তোমার হাতে সমর্পণ করব।

কংস জানে, বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না, তাই সে বসুদেবের কথায় ভগ্নীহত্যা থেকে বিরত থাকল। বসুদেবও কংসের প্রশংসা করতে করতে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন।

যথাসময়ে দেবকী আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ বসুদেব কীর্তিমান নামক প্রথম পুত্রকে কংসের হাতে দিলেন। —মহাদুঃখেও সাধুগণ অটল থাকেন। নির্মম বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা দেখে কংস হাসতে হাসতে বলল, —কুমার ফিরে যাক, একে তো আমার ভয় করার কিছু নেই। তোমার অষ্টম পুত্র আমাকে মারবে। বসুদেব পুত্র নিয়ে এলেও অসৎ কংসের কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না।

নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, তাঁদের স্ত্রীরা, ভৃত্যগণ, বসুদেবাদি বৃষ্ণিগণ এবং তাঁদের দেবকী প্রভৃতি যদুস্ত্রীগণ সকলেই দেবতা। এঁদের জ্ঞাতি, বন্ধু এবং কংসের অনুগতগণ সকলেই দেবতুল্য। দেবর্ষি নারদ এই সব কথা কংসকে বলেছিলেন। পৃথিবীর ভার স্বরূপ দৈত্যগণের বধের জন্য দেবগণের উদ্যোগের কথাও তাকে বলেছিলেন। দেবর্ষি নারদ এই সব কথা বলে চলে যেতেই কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলেন। তাঁদের প্রতিটি পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে বধ করতে লাগলেন। ক্রুর কংস শিশুদের বধ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ নি। এ জগতে রাজাদের মধ্যে মা বাবা ভাই বোনকে হত্যা করতে বহু দেখা যায়।

কংস পূর্বে যখন এই পৃথিবীতে কালনেমি অসুররূপে জন্মেছিল, তখন বিষ্ণু তাকে বধ করেছিলেন। দেবর্ষি নারদের কাছে এই খবর জেনে কংস যাদবগণের সঙ্গে শত্রুতা করতে থাকে। যদু, ভোজ ও অন্ধকগণের অধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করে নিজেই শূরসেন প্রভৃতি দেশের রাজা হয়ে বসল। (ক্রমশঃ)

এই যে ধুলো আমার না এ

মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে মনে আউড়ে নিলাম চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা। চট্টগ্রামকে চলতি কথায় বলা হত চাটগাঁ, এখন আর এই নাম শুনলাম না; তবে ইংরেজদের উচ্চারণে চিটাগং পরে অনেক দোকানের সাইন বোর্ডে দেখেছি। অবিভক্ত বাংলায় চট্টগ্রাম ছিল একটা বিভাগ—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও পার্বত্য প্রদেশ ছিল এর চারটি জেলা। এখনও চট্টগ্রাম একটা বিভাগ। একসময় চট্টগ্রাম ত্রিপুরার হিন্দুরাজাদের অধীনে ছিল। এদের সঙ্গে বৌদ্ধ আরাকান রাজাদের বিবাদ লেগেই থাকত। এ ভাবেই আরাকান রাজ চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। তবে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল যেহেতু এর আয় সরকারী তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণ হয় যে মোগলদের অধিকারভুক্ত ছিল এই জনপদ। ১৬৩৮ সালে আরাকান রাজার প্রতিনিধি মটক রায় কোনও কারণে প্রভুর বিরাগ ভাজন হয়ে বঙ্গাধিপতির বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ অধিকার করে নেয়, এর নাম হয় ইসলামাবাদ। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে চট্টগ্রামকেও ইংরাজদের দিয়েছেন। চট্টগ্রাম পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত ছিল। এদের ঔরসজাত সন্তানদের অধস্তনদের ফিরিঙ্গি বলা হত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য অংশকে মূল চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পার্বত্য প্রদেশ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটী গঠিত হয়। ১৮৯১ সালে এর জেলা সত্তা দূর করে এটিকে একটী মহকুমা করে দেওয়া হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আবার এটী জেলা হয়। বাংলাকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অংশবিশেষ রইল পূর্ব পাকিস্তানে; ত্রিপুরা হল ভারতবর্ষের একটি রাজ্য। অবশ্য ত্রিপুরার মর্যাদা ছিল অন্যরকম। অবিভক্ত ভারতে একসময় ত্রিপুরার দুটি অংশ ছিল—স্বাধীন ত্রিপুরা ও বৃটিশ ত্রিপুরা। এই দুইয়ে মিলে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য। চট্টগ্রামের সঙ্গে ঔরঙ্গজেব ভ্রাতা শাহ সুজার একটা সম্পর্ক হয়েছিল। সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে সুজা ঔরঙ্গজেবের ভয়ে এই চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান রাজ্যে যান। যে রাস্তায় গিয়েছিলেন তা-ই এখন ইরাক-ইরাণী মহাসড়ক।

আজ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, শনিবার। ঘুম ভেঙ্গে গেছে ভোর ছটাতেই। আজ যাব ধলঘাট—সাধুমার জন্মস্থান আর সাধুবাবার সাধনপীঠ ও সিদ্ধিস্থান, যেখানে আছে বহু বিদিত বুড়াকালী মাতার মন্দির—সাধুবাবার সাধনায় যিনি নতুন করে জাগ্রতা। গরম জল পেতে পেতে সাতটা হবে। অন্য সব প্রস্তুতি সেরে, গরমজল সংগ্রহ করে স্নান টান করে সবাই প্রস্তুত হলাম। ঘরে চা দিয়ে গেল। বিস্কুট দিয়ে চা খেলাম। গাড়ি এসে গেছে সাতটাতেই। আজকের চলনদার শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য। সঙ্গে মিহির বাবু, ধ্রুবপ্রিয় বাবুও যাবেন। আরও কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক যাবেন। ধ্রুববাবুর বোন এসেছেন নোয়াখালী থেকে; ভদ্রমহিলা ওখানে গান্ধী আশ্রমে কাজ করেন, আশ্রমেই থাকেন। অশোকা গুপ্ত (শৈবাল

গুপ্তর স্ত্রী)-র লেখায় নোয়াখালী আশ্রমের কথা পড়েছি। সে বিষয়ে কথা হল। বললেন, সময় থাকলে আমাদের নিয়ে যেতেন। বললাম, আবার এলে সুযোগ করে যাওয়া যাবে। বাস ছাড়ল সাড়ে আট টায়। আমাদের উত্তেজনা তো একেবারে চরমে: আমরা সাধুপীঠে যাচ্ছি। সমবেত গুরুকীর্তন হচ্ছে বাসে। আমরা চলেছি। রাস্তায় পড়ল কাজেম আলি স্কুল। একসময় চটগ্রামে তিনজন খ্যাতনামা পুরুষ সাধারণ্যে খুবই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এঁরা হলেন যাত্রামোহন সেনগুপ্ত (দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পিতা), কাজেম আলি ও ইস্পাহানী। শেষোক্ত জন বিরাট ব্যবসায়ী। বাংলাদেশের ইস্পাহানী চা খুবই নামী, আমরা খেয়েছিও। এঁদের তিন জনের নামেই স্কুল আছে। কাজেম আলি স্কুলেই পড়াতেন ধ্রুবপ্রিয় বাবু। একটা বৌদ্ধ মঠ পড়ল রাস্তায়। ডা. খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ক্যাথলিক গির্জা, হাজি মহম্মদ মহসীন কলেজ আর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ দেখলাম। অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গে দুটিই সরকারী কলেজ ছিল—রাজশাহী কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজ; আর দুটিই ছিল অতি বিখ্যাত কলেজ। তখন নিয়ম ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হবার আগে সব অধ্যাপককেই এই দুটীর একটী বা এপারের কৃষ্ণনগর কলেজে কাজ করে আসতে হত। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর স্মৃতিকথায় চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম কলেজ একেবারে জীবন্ত মুদ্রিত হয়েছিল মনের পটে। চট্টগ্রাম কলেজ দেখামাত্রই সেই স্মৃতিসুধা ক্ষরিত হতে থাকল। বাসে টুকটাক খেতে খেতে যাচ্ছিলাম। একসময় বাস থেমে গেল। কী ব্যাপার? না, কর্ণফুলি পার হতে হবে। কর্ণফুলি? এই সেই কর্ণফুলি? সারিবদ্ধ ভাবে গাড়িগুলি সেতুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল। বিরাট নদী। এর উপনদী শানদা দেখলাম কিছুদূরে এসে মিশেছে, বাস থেকে সঙ্গমস্থল দেখা যাচ্ছিল। যত এগুচ্ছি তত হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে। পটিয়ায় ঢুকলাম। ধলঘাট এই পটিয়া উপজেলায়। এর জেলা হওয়ার কথা ছিল—হয়নি। বাজারটা বেশ বড়। পটিয়া বাজার পার হয়ে ডাইনে পেলাম বাংলার গ্রাম আর মাঝখান দিয়ে—না এখন আর সেই মেঠো পথ নয়, আঁকাবাঁকা ইঁটবাঁধানো পথ। ছোট বাস নির্বিঘ্নে চলেছে। এসে গেলাম ধলঘাট। ডাইনে পড়ল যামিনী চৌধুরির ভিটে। টুটুন মনে মনে উদ্বেল হয়ে উঠছে বোঝা গেল। টুটুন যামিনী চৌধুরির দৌহিত্রী। কৈলাসচন্দ্র দত্ত (সাধুবাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)-র কন্যা প্রসন্ন কুমারী (স্বামী অন্নদা চৌধুরি)-র বড় ছেলে এই যামিনী রঞ্জন চৌধুরি। বাঁধন ছেঁড়া আবেগে অন্যরাও উদ্বেল। হ্যাঁ এবার মাইকে গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এসে পড়লাম। সুনু সবাইকে একটা করে মা/বাবার ছবি দিলেন। ওঁর পরিকল্পনা, সবাই গুরুকীর্তন করতে করতে ছবি নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে ঢুকব। এই এলাম, এলাম, এলাম, এসে পড়লাম, এ—লা—ম! বাস থামল একেবারে সিদ্ধাশ্রমের গেটে। নামলাম। সবার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ, চোখে আবেগের অশ্রুধার। লাইন করে মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে ঢুকলাম। কী সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর মন্দির। অপরূপ কারুকাজ করা কাঠের আধারে সাধুবাবার গৌরাঙ্গ মূর্তির ছবি। পাশে মশারি-সংযোজিত একটি খাটে সাধুবাবার আরেকটি

ছবি। এক এক করে সবাই প্রণাম সারছেন। কেউই যেন প্রণাম সেরে উঠে আসতে পারছেন না। আবেশ-বিবশ সবাই, বিশ্বাসও হচ্ছে না যে এ স্বপ্ন না সত্য। সবাই প্রণাম সারলাম, ছবি তুললাম, চোখে জল-মুখে-হাসি সবাই বেরিয়ে এলাম। কাকীমা স্বর্গত কাকার ছবি এনেছিলেন সঙ্গে, সাধুবাবার আসন স্পর্শ করালেন। বাইরে একটা চাঁদোয়ার নিচে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসব কী! বিশ্বগ্রাসী লোভাতুর চোখে আর মনে সব দেখছি—আশপাশ দুদিকে দুটি কুণ্ড। একটিতে বাঁকানো সিঁড়ি আছে—সেটা একটু বড়ো, এর অপর পাড়েই বুড়াকালী মন্দির। কোনটির নাম তারাকুণ্ড? দুরকম মত শুনলাম। যাহোক বাবা, দুটোইতো সাধুবাবার শ্রী-অঙ্গের স্পর্শ পেয়েছে। জল নিয়ে মাথায় দিলাম, মাটির তিলক দিলাম কপালে। মনে হচ্ছিল, যদি সম্ভব হত তবে নগ্ন হয়ে সারা অঙ্গে মেখে নিতাম এই বিভূতি মৃত্তিকা! কিন্তু তা কী আর সম্ভব? আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হল মন্দিরের ডানদিকে টিনের চালার একটা বড় বাড়িতে। বাড়িটা—গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কের। অফিসের পাশের বড় ঘরটায় টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসানো হল। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে একটা পুষ্পস্তবক দেওয়া হল। জলখাবার পরিবেশিত হল—নিম্‌কি আর পেল্লাই আকারের একটা চম্‌চম্‌ আর চা। সবাই এবার গেলেন বুড়া কালীমার মন্দিরে। আমি কথা বলতে লাগলাম একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী কাজি আবুল বসর নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে। পরিচয় পেলাম যে ভদ্রলোক একজন অতি অমায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন অতি সজ্জন মানুষ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় হিন্দুদের অনেক সাহায্য করেছেন। শেষ এখানে দাঙ্গা হয় ১৯৯২-এ বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায়। জনান্তিকে হিন্দুরা বলেছিলেন যে, ওঁরা ওখানে একটু ভয়ে ভয়েই থাকেন। কাজী সাহেব আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। খুব সঙ্গতভাবেই উনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। বাংলাদেশের শিক্ষা ও অর্থনীতি নিয়ে অনেক কথা বললেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, সেই প্রসঙ্গে মহম্মদ ইয়ুনুসের প্রসঙ্গ এল। উনি বিশ্বাস করেন যে ইয়ুনুসের পথে দারিদ্র্য দমিত হবে। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হলে পৃথিবীতে সাম্য আসবে না এ-ই তাঁর বিশ্বাস। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অশেষ কৌতূহল। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শুনে কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বললেন, "ঘুরে আসুন, আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে খুব ভালো লাগতাছে। অনেক কিছু জানার আছে।" অন্যরা আমাকে বার বার খবর পাঠাচ্ছিলেন যে! (ক্রমশঃ)

উপনিষদ কী ও কেন

শ্রীসুনীল রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন উপনিষদ

১১শ শ্লোক—পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব
আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥১১

সরলার্থ—কালবিদগণ আদিত্যকে (সূর্যকে) পঞ্চপাদযুক্ত, দ্বাদশ-আকৃতি-বিশিষ্ট, দ্যুলোকের পরার্ধে অবস্থিত, জলবর্ষণকারী পিতা বলেছেন। অন্য কালবিদেরা বলেন—উর্দ্ধদেশে সাতটি চক্র ও ছয়টি শলাকা বিশিষ্ট রথে স্থিত সর্বোচ্চ আদিত্যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

(সূর্যদেব তাঁহার কিরণ দ্বারা (উত্তাপ) পৃথিবী হতে জল গ্রহণ করে, বৃষ্টিরূপে পুনরায় তাহা ত্যাগ করেন।)

পঞ্চপাদম্—পাঁচটি ঋতুই আদিত্যের পাদস্বরূপ। সেই পাঁচটি পদদ্বারা আদিত্য পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শীত ঋতুকে একটি ঋতু ধরা হয়েছে।

দ্বাদশ আকৃতিম্—দ্বাদশমাস যার আকৃতি বা অবয়ব।

দিব পরে উর্দ্ধে—দ্যুলোকের উপর তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত।

সপ্তচক্রে— সপ্ত অশ্বরূপ চক্র(সংসার চক্র)।

ষড়র—ছয়টি ঋতুযুক্ত রথ।

১২শ শ্লোক—মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য
কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ।
তস্মাদেত ঋষয় শুক্ল ইষ্টং
কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥১২

সরলার্থ—সম্বৎসরের ন্যায় মাসও প্রজাপতি। এর একাংশ প্রাণরূপী শুক্লপক্ষ অপরাংশ কৃষ্ণপক্ষ (অজ্ঞানের প্রতীক)। এই কারণে প্রাণদর্শী ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন, অন্যান্যরা কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করেন অর্থাৎ অজ্ঞানেই তা করে থাকেন। সুতরাং শুক্লপক্ষ জ্ঞানের প্রতীক, কৃষ্ণপক্ষ অজ্ঞানের প্রতীক।

১৩শ শ্লোক—অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব
প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ।
প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা
রত্যা সংযুজ্যন্তে, ব্রহ্মচর্যমেব তদ্
যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥১৩

সরলার্থ—দিনরাত্রি রূপ যুক্ত অবস্থাই প্রজাপতি। তার দিবাভাগই হল প্রাণ আর রাত্রি হল রয়ি। কারণ দিবাভাগেই জীবের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া পূর্ণরূপে দেখা যায়, রাত্রিভাগে জীব নিস্পন্দ হয়ে নিদ্রিত থাকে। অতএব যারা দিবাভাগে রতিক্রিয়া করে, তারা প্রাণকেই দেহ হতে ক্ষয় করে আর ঋতুকালে রাত্রিতে যারা রতিক্রিয়ায় সংযুক্ত হয় তাহা দ্বারা ব্রহ্মচর্যেরই অনুষ্ঠান করা হয়। ইহা আয়ুষ্কর এবং সন্তানসন্ততি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ

রাখে যাহা গৃহস্থের একান্ত কর্তব্য।

১৪ শোক—অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি ॥১৪

সরলার্থ—অন্নই প্রজাপতি। এই অন্ন হতে শুক্র (নৃবীজ) উৎপন্ন হয় এবং শুক্র হতে প্রাণীসকল জন্মগ্রহণ করে।

অন্নরূপ প্রজাপতি সৃষ্টিক্রমে শুক্ররূপে পরিণত হয়। কারণ ভুক্ত অন্নই জীবদেহে জীর্ণ হয়ে রস, রক্ত ও শুক্র উৎপন্ন করে। এই শুক্রও প্রজাপতিস্বরূপ, সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক এবং সৃষ্টিকার্যে সক্ষম। [এখানে প্রজাপতি অর্থে সৃষ্টিকারণ বা সৃষ্টিকর্তা]।

১৫শ শ্লোক—তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতি ব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

সরলার্থ—যাঁরা কায়, মন ও বাক্যের সংযম পালন করে একাগ্রচিত্তে প্রজাপতি ব্রত (সৃষ্টি-কার্য) পালন করেন তাঁরা পুত্র-কন্যা উৎপাদন করে থাকেন। তন্মধ্যে যাঁদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য অটুট আছে এবং যাঁরা সত্যনিষ্ঠ ও সত্যব্রতী তাঁরা মৃত্যুর পর পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন (জন্মগ্রহণ করেন)।

১৬শ শ্লোক—তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ। ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি ॥১৬

সরলার্থ—যাঁদের মধ্যে কুটিলতা, মিথ্যাচরণ, অসত্য. মায়া (মোহ ও আসক্তি) নেই, তাঁরাই সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোকে (দেবযানরূপ স্বর্গলোকে) গমন করে থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করে, প্রজাপতি ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রকন্যা সৃষ্টি করেন ও অবশেষে বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু আশ্রমে প্রবেশ করেন, সেই সকল বাণপ্রস্থীদের মধ্যে কোনপ্রকার কপটতা, মিথ্যাচরণ এবং বিষয়াসক্তি জনিত মোহ থাকে না, তাঁরা নির্মল ব্রহ্মলোকে গমণ করে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। (ক্রমশঃ)

"চরিত্র পবিত্র করে মানব জীবন।
সত্য রাখি কর সবে হৃদয় গঠন॥"

—শ্রীতারাচরণ

মহাভারতের শাশ্বত কথা

শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ

সনাতন ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার সামাজিক তাৎপর্য থাকলেও এর কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। এই ধর্মের মূল তত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রাণী মাত্রেই—'ব্রহ্মজ'। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। দেহ নয় আত্মাই প্রধান। দেহের বিনাশ আছে, আত্মা এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম অভিন্ন।

গত সংখ্যায় আমরা দেখেছি বর্ণ বিভাগ চার ধরণের যা মূলত কর্ম নিরিখে বিন্যস্ত। এই চারটি বর্ণ বা জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কর্মের তাৎপর্য অনুসারে মানুষের বর্ণ চিহ্নিত হবার পরিচয়ও আমরা দেখেছি। বংশানুক্রমিক জাতিবিন্যাস প্রাচীন কালেও স্বীকৃত ছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির বনপর্বে পরিষ্কার বলেছেন ব্রাহ্মণত্বের বিচার মানুষের আচরণ অর্থাৎ চারিত্রিক গুণাবলী, সত্য, ক্ষমা, দান, সদ্‌গুণ ইত্যাদির দ্বারাই বিচার্য। তিনি আরো বলেছেন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তাকে যেমন ব্রাহ্মণ বলা যাবে না আবার অন্য পক্ষে পিতামাতা শূদ্র হলেই কাউকে শূদ্র বলে চিহ্নিত করা যাবে না। আরো আগে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখি, জবালা পুত্র সত্যকামের স্পষ্ট, অকপট সত্য ভাষণ শুনে মহর্ষি গৌতম তাকে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণ বলেছে, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই তারা এক বর্ণের। সমস্ত মানুষের জনক এক, আর একই জনকের সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাত হতে পারে না।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন মহর্ষি ভরদ্বাজ। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, মানুষ মাত্রেই কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা আর শ্রম এই সবেই কম বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে, তা হলে জাতিগত তফাৎ কোথায়—এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব মহাভারতের শান্তিপর্বে অন্তর্ভুক্ত ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ। এই সংবাদে আত্মার অস্তিত্ব, পুনর্জন্ম প্রভৃতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, আছে নৈয়িক অর্থাৎ তার্কিক যুক্তি-প্রতিযুক্তির মীমাংসা। বর্তমান আলোচনা আমরা কেবলমাত্র জাতিভেদ বা বর্ণভেদ অংশটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখব। গত সংখ্যায় উল্লেখ করেছি, আবারো বলছি, এই সংবাদ আমাদের প্রাচীন ন্যায় দর্শনের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

মহর্ষি ভৃগুর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা জানতে পারি যে, এই সংসার দেব, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, বিভিন্ন প্রকার পশুপাখী, উদ্ভিদ, বৃক্ষলতা, তৃণ, কীটপতঙ্গ হতে মানুষ সবই ব্রহ্মজ—অর্থাৎ, ব্রহ্ম হতে জাত। ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয় বিখ্যাত ঋষি—প্রজাপতিরই অধস্তন সবাই। সমস্ত প্রাণের উৎস যেমন ব্রহ্মা বা আদি প্রজাপতি, তিনি আবার এই সৃষ্টির রক্ষণ বর্ধন এবং শ্রী এই ত্রয়ীর কল্পে সত্য, ধর্ম, তপস্যা, সনাতন জ্ঞান (বেদ), আচার, শৌচ, দণ্ড প্রভৃতিরও প্রবর্তক—বিদধে প্রভুঃ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সমগ্র জগৎ চরাচরই ছিল জলময় —অম্ময়ং সর্বমেবেদমাপো মূর্তিঃ শরীরিণাম. প্রাণী

সমূহের দেহও প্রধানত জলময়। সত্ত্বঃ রজ এবং তম এই তিন প্রকৃতি নিয়ে প্রতিটি জীবের উদ্ভব। সেজন্য ত্রিগুণযুক্ত জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। যিনি এই ত্রিগুণ-রহিত, সেই চিন্ময় শক্তিই পরমাত্মা। প্রতিটি জীবই পঞ্চভূতের আধার। এই পঞ্চভূত হলো—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পাঁচটি বিষয়ে জীবের আসক্তি সে কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। আবার জীব দেহটি মাংস, রক্ত, মেদ, স্নায়ু এবং অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। মজার কথা হলো, এই দেহের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক যা দিয়ে সে আপন আসক্তি অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শকে অনুভব করে তা কিন্তু ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়। এদের পেছনে মন বা চৈতন্য নামে এমন একটি শক্তি রয়েছে যা এদেরকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যমনস্ক থাকলে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া জিনিস তো আমরা দেখতেই পাই না, শুনতেও পাই না।

তাহলে দেখা গেল পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া জীবের আরো একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে সেটি হলো 'মন'—যাকে সব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা নিয়ন্ত্রক বলা হয়। এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ যার মধ্যে সমধিক রয়েছে সেই জীবটিই হলো মানব। মন আছে বলেই সে চিন্তা করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। তার জীবন পরিধিকে সে উন্নত করতে পারে। মনের আবার নানান্ স্তর রয়েছে, সেই বিচারে মানুষে মানুষে তফাৎও আছে। বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা সবই মনের উন্নত স্তরের বিষয়। এককথায় মানব বা মানুষ মাত্রেই মনোময় জীব।

অতীতে মানুষ বাঁচার তাগিদে যখন বাসা বাঁধল, সমাজ গড়ল, তখন হতেই তারা নানা অনুশাসনে নিজেদের বাঁধল। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠল নানান্ বিশ্বাস, সংস্কার। ভাল-মন্দ দুই মিলিয়ে শুরু হল পথ চলা। নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জন, যুক্তি-বিশ্লেষণ চলল পায়ে পায়ে। বাঁচার তাগিদে মানুষই নিল স্রষ্টার ভূমিকা। কত উদ্ভাবন, নতুন চিন্তা ঠাঁই পেল এই সরণীতে। ক্রমশ সে হয়ে উঠতে লাগল দক্ষ, কুশল। এই দক্ষতা বা কুশলতা আবর্তিত হলো গোষ্ঠী ঘিরে। গোষ্ঠী হতে পরিবারে যা বিশেষ বিশেষ স্থানে গড়ে উঠল বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে। পরিবারের নির্দিষ্ট মানুষের হাতে তার সূক্ষ্মতা, কুশলতা অপরূপ রূপ পেল। এই দক্ষতাকে ধরে রাখার জন্য তার চর্চা যেমন নিবিড় হল ঐ বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ গোষ্ঠী বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এবং তা সম্প্রদায়গত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে রইল জন্মজন্মান্তরের বিশেষ চর্চায়, অনুশীলনে। সমাজ এই সব পরিবার কিংবা গোষ্ঠীদের ঐ সব বিশেষ গুণের জন্য স্বীকৃতিও দিল। মান্যতা, প্রতিষ্ঠা এবং পরিচয় সবই এল বিশেষ গুণের পারদর্শিতার নিরিখে।

এই বিশেষ গুণাবলী কি? সামাজিক মানুষের বাঁচার জন্য যেমন, তেমনি মননশীল মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদার দিয়ে লক্ষ্য রেখে, তার উন্নতি, প্রগতি, শ্রীবৃদ্ধি সব কিছুকেই কেন্দ্র করে মানুষ কিছু বিশেষ বিষয়ের চর্চা শুরু করেছিল। যার মধ্যে প্রধান প্রাণরক্ষা, আত্মরক্ষা। তার পর ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কের চর্চা। মননের গভীর অনুশীলন। আদি পর্বের নিয়াণ্ডারথাল মানুষ, সোয়ানকুম মানুষ হতে ক্রোম্যাগনন বা আধুনিক মানুষের

ক্রমপর্যায়ে এ ধারা অব্যাহত। প্রজ্ঞার ধারক এবং বাহক বলে মানুষের পরিচয় আমরা বহন করে চলেছি অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ, তারাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল ককেসয়েড, মঙ্গোলয়েড এবং নিগ্রয়েড এই তিন ভিন্ন জাতির গোষ্ঠী পরিচয়ে।

বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ জাতি আমরা দেখি সবারই কিন্তু একই বর্গ (Genus) এবং প্রজাতি অর্থাৎ Species হতে জাত। মূলত জিনঘটিত পরিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিনের নিষ্ক্রিয়তা, পরিবেশগত প্রভাব এবং জন মিশ্রণের প্রভাবেই মানুষের বহু পরিবর্তন এবং বিভিন্নতা। ক্রমবিকাশের সুশৃঙ্খল সারণি বেয়ে মানুষের যে পথ চলা—তার বাঁচার মূল মন্ত্রই হয়ে দাঁড়াল 'এগিয়ে চলো'—চরৈবেতি। কারণ চলা বা এগোনোই জীবন আর থামা-ই যে মৃত্যু।

তুষার যুগ হতে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে মানুষের ক্রমবিবর্তন এবং ক্রমবিকাশ এক সাদৃশ্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল ধারায় এগিয়েছে। তুষার যুগ তার পরবর্তী - দীর্ঘ শুষ্ক কাল, প্রস্তর যুগের আদি, মধ্য এবং নব প্রস্তর যুগ, যাদের পরিচয় ভারতবর্ষের দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী, তাম্র. ব্রোঞ্জ, লৌহ এবং সোনা-এযুগে যাকে নব - প্রস্তর যুগ আখ্য দেওয়া হয়েছে—তাদের নিদর্শন-তো সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। এ সময়ে মানব সমাজ এবং জীবনচর্যা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সৃষ্টি হলো ধর্ম—যা মূলতঃ স্বভাব এবং শৃঙ্খলা। বিবর্তনের ধারায় মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রাণময় অন্নসত্তা, জৈবিক সত্তা হতে মনোময় সত্তায় উন্নীত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতিকে চিনতে শিখেছে।

প্রকৃতির মধ্য হতে মানুষ শক্তি সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল। সে যেমন বুঝল মানুষ মূলত দু' ধরনের নর এবং নারী। তেমনি, এই প্রকৃতির মধ্যে দু ধরনের শক্তি নিয়তই নীরবে কাজ করে চলেছে। বহু বিচিত্র এই বসুধা যেমন সদা পরিবর্তনশীল, তেমনি অনন্ত আকাশ ঘিরে যে বিশ্বচরাচর তাও পরিবর্তনশীল, সক্রিয় এবং অনন্ত শক্তিশালী। তার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন না করতে পারলে সে টিকতে পারবে না।

বিশ্ব-জগতের একদিকে অনন্ত রহস্য। তার বিপুল শক্তি মানুষের মনে যেমন ভয় সৃষ্টি করল, তেমনি এই ভয় হতে ত্রাণের উপায়ও সে নিত্য অনুসন্ধান করে চলল। একদিকে ভয়জনিত পূজা, অন্ধবিশ্বাস, নানান্ লৌকিক আচার, সংস্কার যেমন গড়ে উঠল, অন্য দিকে নিরন্তর চলল গভীর অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ. কার্য-কারণ খোঁজার নিবিড় প্রচেষ্টা। এই দুয়ের মাঝখানে মানুষ লাভ করল অপূর্ব সম্পদ। সে মুগ্ধ হল বিশ্ব প্রকৃতির অপরূপতাকে প্রত্যক্ষ করে, তার বৈচিত্র্য আস্বাদন করে, তার বিপুল শক্তিকে উপলব্ধি করে। ভয় মুছে গেল ধীরে ধীরে, কারণ মানুষ বিশ্বচরাচরের অনন্ত রহস্যের ঘন আবরণ যে একটু একটু করে উন্মোচন করে তাকে চিনতে জানতে এবং ক্রমেই ভালবাসতে শিখেছে। জন্ম নিল শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং কর্তব্য বোধ। সংকটকালে যা ছিল শুধুই ভয়ের তা ক্রমশই

পর্যবসিত হলো বিস্ময়ে, ভক্তিতে, সম্ভ্রমে। নিখিল বিশ্ব তার কাছে ধরা দিল মহিমময় রূপে, পরমাত্মার স্বরূপে—পূজিত এবং প্রণম্য হলো বিশ্বাত্মার স্বরূপে। নানা:ন্ বিশ্বাস, নানান উপলব্ধি এবং নতুন শক্তি নিয়ে এই মাটিতে এ:ক একে গড়ে উঠল নানা:ন্ সভ্যতা, কৃষ্টি।

ভারতবর্ষের সবচাইতে প্রাচীন সভ্যতা—সিন্ধু সভ্যতা, আর্য সভ্যতা তার অনেক পরের। এই সিন্ধু সভ্যতা কৃষি ছাড়াও নগরায়ণ বিষয়ে পরবর্তী আর্য সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। সাধারণ ধারণা, দাস, দস্যু, পণি, অসুর, কিরাত, নাগ এবং নিষাদ সভ্যতা—অসভ্য বর্বর, বৈদিক সাহিত্যে আমরা অনেকটা সেরকমই পরিচয় পাই, কিন্তু, শ্র:দ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২২-২৩) যুগান্তকারী আবিষ্কার—সিন্ধু সভ্যতা (মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পা) বহু দিনের সেই ধারণাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই সব জনজাতির নিজস্ব ভাষা ছিল, কৃষ্টি ছিল, উন্নত কারিগরী বিদ্যা ছিল। তার সাক্ষ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগান্তকারী প্রত্নতত্ত্ব খননের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। এর অনেকটাই এখনো অনাবিষ্কৃত। যেটুকু পাওয়া গেছে তার গুরুত্ব অসীম। (ক্রমশঃ)

কান্ত কবি শান্ত কেন

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কান্তকবি হাসপাতালের রোগ শয্যায় হাজারো যন্ত্রণার মধ্যেও অনবদ্য সব সংগীত রচনা করে গেছেন। তিনি রোগ শয্যায় শুয়ে লিখেছেন—

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ নয়ন কর অন্ধ
চির - যবনিকা পড়ে যাক হে, নিভে যাক রবি, তারা, চন্দ্র।
হরে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের যন্ত্র,
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ;
স্পর্শ হর হে হরি। লুপ্ত করে দাও অসাড়। নিস্পন্দ।
(তুমি) মূর্তিমান হয়ে এস প্রাণে। শব্দ স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুক্তিতে সে মিলনানন্দ ”

রোগের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হত তখন কবি সংগীত রচনা করে পরম শান্তি লাভ করতেন। তিনি বন্ধুদের বলতেন, চিকিৎসকদের বলতেন, যন্ত্রণা যখন বাড়ে তখন লেখনী চালিয়ে আমি রোগ যন্ত্রণা যেন ভুলে যাই, তখন সৃষ্টির আনন্দে মন বিভোর হয়ে থাকে। রোগের ওই কঠিন যন্ত্রণা ভোলার আর অন্য কোন পথ আছে বলে মনে হয় না। কান্তকবির পরম বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, তাঁহার কবিতা ত সুন্দরই, কিন্তু কবিতা-অপেক্ষাও মৃত্যুশয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব আমার নিকট বেশি সুন্দর বোধ হইত।' যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মৃত্যু ভীতি তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহার ভাবময় জীবনের মধুরতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় ভাবুক কবির জন্ম বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।'

কান্ত কবি যখন হাসপাতালে প্রথম ভর্তি হন তখন তিনি বালক বালিকাদের জন্য লিখলেন 'অমৃত' নামে গ্রন্থ। তিনি চল্লিশটি অষ্টপদী কবিতা রচনা করেন অমৃত গ্রন্থে। অমৃতের কয়েকটি কবিতা 'দেবালয়' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাকী সব কবিতা কবি রোগ শয্যায় শীর্ণদেহে অসাধারণ নীতিমূলক কবিতা রচনা করেন। দুটি অনবদ্য কবিতা এখানে তুলে ধরা হল :

ক্ষমা

দশবিঘা ভূঁয়ে দিল আশি মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,
খেয়ে গেছে প্রতিবাসী গোয়ালার গরু।
ক্ষেতগুলি পড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু!
ক্ষেতের মালিক, আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ী, চাষা বলে, ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম সন্তোষ,
গরু তো বুঝে না কিছু, ওদের কি দোষ?

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন
উত্তরাধিকার স্বত্বে পায় বহু ধন;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে চাষী এত পেলি, আমারে কি দিবি?
চাষী বলে, অর্দ্ধভাগ দিব সুনিশ্চয়।
গণনায় অর্দ্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়।
সবে বলে, কি দলিল? কেন দিতে যাস?

চাষী বলে, কথা দিয়ে ফেলিয়াছি, বাস।'

'অমৃত' গ্রন্থটি পড়ে অনেকে বলেন, শিশুরা এই অমৃতে নবজীবন লাভ করবে। বাংলা ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে অমৃত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দু মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের হাজার কপি বই বিক্রী হয়ে যায়। আষাঢ় মাসে অমৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক মাসের মধ্যেই এই সংস্করণের হাজার কপি নিঃশেষিত হয়। শ্রাবণ মাসে অমৃতের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কান্তকবি শ্রীভগবানের চরণে লীন হবার জন্যে যেন প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে লিখলেন:

মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে?
রক্ত বহিবে মর্ম ফাটিয়া;
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া
ধর্ম পক্ষে মর্ম লক্ষ্যে
মৃত্যু বরিবে কে?
অক্ষয় নব কীর্তি - কিরীট
মাথায় পরিবে কে?
বলিয়া, সে দিন হুংকার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাস;
(হায়) ধর্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্বনাশ!
চেয়ে দেখি কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর।
আমার ধ্বনির উত্তর শুধু
মানবের পরিহাস;
(আমি) ধর্মের শিরে নিজেকে বসায়ে
করেছি সর্বনাশ!
এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াবো আপন মান;
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী বাহিরে
করিনু আসন দান,
তাই বিধাতার হইল বিরাগ
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দম্ভ ধূলায় ফেলিয়া
আজ ডাকি 'ভগবান্'
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ,
কর তোমাগত প্রাণ।"

এই গানটি রচনা করার কিছুক্ষণ পরেই কান্তকবি রোগ শয্যায় শুয়ে সকলের প্রিয় অত্যন্ত জনপ্রিয় গানটি রচনা করেন।

আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ,
গর্ব্ব করিতে চূর,
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর,
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেদিল মোরে অহমিকা-কূপে
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকামতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি।
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপূর;

তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।
ভাবিতাম, আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চূর।'

একদিনের কথা। ভোরের আলো ফুটল। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করল। সারারাত তিনি কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। সারা রাত তিনি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি লিখলেন এক সুললিত সুমধুর সংগীত। চারপাশে তখন কাঁসর ঘণ্টা বেজে চলেছে। কবি শুনতে পেলেন শাঁখের আওয়াজ। কবির লেখনী সচল হল :—

প্রভাতে যখন পাখী গাহিল প্রভাতী
আলোকে বসুধা ভরপুর;
পূর্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ ধীর সমীর মধুর;
মঙ্গল আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি গান।
কোথায় লুকালে প্রভু? মুক্ত চরাচরে
বলে দাও তোমার সন্ধান।
অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার;
মুদিয়া আসিল দুনয়ন;
দেবতা কহিল ডাকি, মানসে তোমার
আন পূজা করিব গ্রহণ।

কান্তকবি হাজারো অভাব যন্ত্রণার মধ্যেও ভগবানের করুণার পরিচয় লক্ষ্য করে লিখলেন :

তখন বুঝিনি আমি,
দয়াল হৃদয় স্বামী।
পাঠায়েছ শুভাশিস্
দারুণ বেদনা ছলে

কান্তকবি আরো লিখেছেন :

তারপরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! একী?
শাস্তি কোথা? শুধু দয়া,
শুধু প্রেম - প্রতি পলে!

[ক্রমশঃ]

নবম কিস্তি

লাদাখ ঘুরে এলাম

মাধুরীসুধা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নুব্রা ভ্যালি যাব বলে জামাকাপড় গুছিয়ে তৈরী হলাম। রাত্রে থাকতে হবে। হোটেলের ঘর রাখা, ছাড়া নিয়ে একটু অশান্তি হল। শেষ পর্যন্ত যার যার ঘরে সে তালা মেরে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। এদিকে জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল আসাতে সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে জানানো হল। আমরা সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে শান্তিস্তূপে গিয়ে বসে থাকলাম। সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরামেই ছিলাম। নীচে নেমে পাহাড়ে ওঠার গাড়ির লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে থাকল। সপারিষদ রাজ্যপাল হেমিসগুম্ফার

মুখোশ নৃত্য দেখে আবার আমাদের রাস্তাতেই চলে গেছেন খারদুংলা। যতক্ষণ না কন্‌ভয় ফিরল আমরা সারি সারি দাঁড়িয়েই থাকলাম প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। পাহাড়ের মাথাতেও হুটার লাগানো গাড়ি রাজ্যপালকে সসম্মানে নামিয়ে আনল। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। অবশ্য খানিকটা যেতে না যেতেই মিলিটারী কনভয়ের পিছনে পড়লাম। এরা একসঙ্গে ২০/২৫টা ট্রাক বেরোয় এবং এমন শম্বুকগতিতে চলে—পিছনের গাড়িকে এগোতে দেয় না। এজন্য ড্রাইভাররা মিলিটারী কন্‌ভয় দেখলে আঁতকে ওঠে। রাস্তা খারাপ। তার উপর বৃষ্টি শুরু হল। বরফও পড়তে থাকল। এই অভিজ্ঞতা আমার নতুন। লে থেকে খারদুংলা ৩৯ কিঃ মিঃ। মিলিটারী কনভয় কাটাতে কাটাতেই পৌঁছে গেলাম ১৮৩৮০ ফুট উচ্চতায়। বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম রাস্তা। এখানে বরফ ভর্তি। তবে এত গুলো গাড়ী একসঙ্গে ঢুকেছে, আর এত লোক গিজগিজ করছিল যে পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম রাস্তাতেও কোন রোমাঞ্চ অনুভূত হল না। উপরের মন্দির যেতে অনেকটা উঠতে হত—একা ঠিক সাহস হল না। এবারের যাত্রায় সঙ্গী পেলাম শেহক নদীকে। তিব্বত থেকে নেমে আসা। খরদুংগ্রাম পেরিয়ে এ নদী সমুদ্রের ঢেউ এর মত জলবিস্তার নিয়ে পাশে পাশে চলেছে। আবার পাহাড়ের দণ্ডী বেয়ে উপরে ওঠা।

হামিদভাই এবার উঁচু পাহাড়ের মাথায় এত সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে গাড়ী দাঁড় করাল, যেখান থেকে নীচে নদী এবং বালির উপত্যকা ঠিক যেন ভূগোল বইতে আঁকা ম্যাপ। নদী আর বালিয়াড়ির লুকোচুরি খেলা ছবি। ভারত সরকারের তৈরী সুন্দর বসবার জায়গায় বসে হাওয়া খেয়ে গলা ছেড়ে গান ধরলাম সবাই—"আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ।" কর্তামশাই মুখস্থ কবিতা বিদ্রোহী বলতে লাগল। সবাই খুশি হলাম এমন জায়গায় কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে। আবার গাড়ীতে ওঠা। এবার সাঁ সাঁ করে গাড়ী নামল সেই উপত্যকায় যেখানে কালো চুলের মত পিচের রাস্তা উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল—পুরো মরুভূমিটাকে দুভাগ করে ফেলেছে। সেই রাস্তায় হামিদভাই গাড়ি প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। মাইলখানেক যেতে না যেতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। আকাশ থেকে মেঘ নেমে এসেছে পর পর, যেন কেউ সাদা কাপড় আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তার একটা মাথা এসে ঠেকেছে মাটিতে। অথচ সেগুলো মেঘ। যেন হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল পরপর এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে। মনে হল 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!' পরিষ্কার আকাশ থেকে সাদা মেঘের ঝাড় ঝুলছে। হামিদভাই এবার আমাদের তাড়া দিয়ে গাড়ীতে ওঠাল। আরও মাইলখানেক যাবার পর দেখলাম কিছু একটা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে। হামিদ ভাই বলল ঝড় উঠেছে। আমরা দুদ্দাড় গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। বিপুল বালির রাশি অন্ধকার মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে। খালি চোখে তাকানো যাচ্ছিল না-. সানগ্লাস পরে নিয়েছিলাম। হামিদভাই এখানেও থাকতে দিল না। কারণ বালিতে গাড়ি ভর্তি

হয়ে যাচ্ছিল। প্রকৃতি কতরূপে যে আমাদের সামনে এল আর বারে মুগ্ধ করল! আবার সমতলভূমি ছেড়ে উপরে উঠলাম। এখানে পেলাম ঝর ঝর ঝরণার ধারা। তার কিছু দূরেই প্রাচীন গুম্ফা। জায়গাটার নাম দিস্‌কিট। এখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে চা-পরোটা খাওয়া হল। কেউ কেউ মোমো খেল। আবার একটা বালিয়াড়ি পেরোলাম—জায়গাটার নাম হাণ্ডার। কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি—এখানে ছুকুঁজওয়ালা উট আছে। আরও সাত কি মি পেরিয়ে তবে পৌঁছলাম এখানে। এর উচ্চতা ৮৫০০ ফিট। আমাদের রাত্রি যাপন করার ইচ্ছে নুব্রা বা নোব্রা যার স্থানীয় অর্থ সবুজ। আরও এগিয়ে আমরা বিশাল এক পাহাড়ের পাদদেশে যে হোটেলে গিয়ে উঠলাম তার সামনে দিয়ে কুলুকুলু স্বরে বয়ে যাচ্ছে শেহক নদী। এমন কি আমরা যে ঘর পেলাম তার নীচে দিয়ে চলেছে সেই নদীর কলতান। সারারাত্রি শুনলাম সেই গান। (ক্রমশঃ)

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের শুভ ১২৮ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীতারামঠে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি, আলোচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীর তালিকা ২০০৭

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

ক—বিভাগ (৩-৪ বৎসর)

১ম—সুচরিতা সরকার : নরেন্দ্র কিশোর চক্রবর্ত্তী স্মৃতি পদক।

২য়—সপ্তর্ষি মণ্ডল : বীরেন্দ্র নাথ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—বিজয় বিশ্বাস : বৈকুণ্ঠ চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার

খ—বিভাগ (৫-৬ বৎসর)

১ম—অর্পণ দে : দেবী প্রসাদ সেনগুপ্ত স্মৃতি পদক।

২য়—সুপর্ণা ঘোষ : উপেন্দ্র নাথ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—সাগরতীর্থ সেনগুপ্ত : সত্যেন্দ্র নাথ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার।

গ—বিভাগ (৭-৮ বৎসর)

১ম—রূপকথা বিশ্বাস : অমলা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পদক।

২য়—সায়নী মণ্ডল : মহেন্দ্র নাথ ঘটক স্মৃতি পরস্কার।

৩য়—মৌমিতা দত্ত : সরোজিনী শীল স্মৃতি পুরস্কার।

ঘ—বিভাগ (৯-১০ বৎসর)

১ম—শ্বেতা আঢ্য : পামেলা দে স্মৃতি পদক।

২য়—ইন্দ্রাণী ঘোষ : সুশীল শীল স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—মণিদীপা ঘোষ : ডাঃ বিজয়রত্ন সুর স্মৃতি পুরস্কার।

ঙ—বিভাগ (১১-১২ বৎসর)

১ম—সোনিয়া দাস : রমেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি পদক।

২য়—জীবনদ্যুতি বেরা : সাধনা দাস স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—দেবাশীষ নস্কর : সুকুমারী রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

চ—বিভাগ (১৩-১৫ বৎসর)

১ম—শুভ্রদীপ পাল : কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত স্মৃতি পদক। ঈপ্সিতা বসু মল্লিক : অমলা সেন স্মৃতি পদক।

২য়—শুভ দে : রেণু বন্দোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—সুনীতা চৌধুরী : মানসী চক্রবর্ত্তী স্মৃতি পুরস্কার।

আলোচনা প্রতিযোগিতা

খ—বিভাগ (৫-৬ বৎসর)

১ম—অমিত দাস : বনলতা হালদার স্মৃতি পদক।

২য়—অভিজিৎ প্রামাণিক : রমা রায় চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—তৃষা দত্ত : কালিদাস গাঙ্গুলী স্মৃতি পুরস্কার।

গ—বিভাগ (৭-৮ বৎসর)

১ম—পল্লবী সাউ : শৈলবালা সেন স্মৃতি পদক।

২য়—সুপর্ণা প্রামাণিক : সারদা প্রসাদ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—দেবযানী জানা : পুষ্পিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার।

ঘ—বিভাগ (৯-১০ বৎসর)

১ম—শ্বেতা আঢ্য : হরেন্দ্র লাল সেন স্মৃতি পদক।

২য়—ইন্দ্রাণী ঘোষ : হরেন্দ্র নাথ সরকার স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—সবিতা কর : শেফালী বসু স্মৃতি পুরস্কার।

ঙ—বিভাগ (১১-১২ বৎসর)

১ম—ইরাবতী দত্ত : শোভা রায় স্মৃতি পদক।

২য়—জীবন দ্যুতি বেরা : সুধীর চন্দ্র দত্ত স্মৃতি পুরস্কার

৩য়—সোনিয়া দাস : সত্য প্রতিম বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার।

চ—বিভাগ (১৩ - ১৫ বৎসর)

১ম—শুভ্রদীপ পাল : পার্থসারথী সেনগুপ্ত স্মৃতি পদক। ঈপ্সিতা বসুমল্লিক : বিভাবতী দেবী স্মৃতি পদক।

২য়—শুভ দে : সুধীন্দ্র নাথ স্মৃতি পুরস্কার।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

ক—বিভাগ (৩-৪ বৎসর)

১ম—পলাশ কয়াল : গিরিবালা দেবী স্মৃতি পদক।

২য়—অস্মিতা হালদার : ভবতোষ দত্ত স্মৃতি পুরস্কার

৩য়—সৌরভ দাস : গৌরী ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার।

খ—বিভাগ (৫-৬ বৎসর)

১ম—সর্বজিৎ ঘোষ : নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক।

২য়—শৌনক চ্যাটার্জী : অমরেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—অর্ণব দে : ধীরেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার।

গ—বিভাগ (৭-৮ বৎসর)

১ম—দীপঙ্কর হালদার : সুবর্ণলতা গুহ স্মৃতি পদক।

২য়—পল্লবী পাল : শৈল রাণী দেবী স্মৃতি পুরস্কার। শচীন বারুই : অশ্বিনী কুমার সান্যাল স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—আদিত্য রায় : নমিতা সরকার স্মৃতি পুরস্কার। প্রজ্ঞা চৌধুরী : গিরিবালা দেবী স্মৃতি পুরস্কার

ঘ—বিভাগ (৯-১০ বৎসর)

১ম—হিমাদ্রি দে সরকার : ননীগোপাল দাস স্মৃতি পদক।

২য়—অভিষেক রায় : কমলা প্রসাদ রায় স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—আদিত্য দাস ও মণিদীপা ঘোষ : যোগমায়া সান্যাল স্মৃতি পুরস্কার।

ঙ—বিভাগ (১১-১২ বৎসর)

১ম—অরিজিৎ মোদক : নীলিমা বিশ্বাস স্মৃতি পদক।

২য়—ঈপ্সিতা বণিক : নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—অর্চনা রায় : অচলা দেবী স্মৃতি পুরস্কার। জুঁই পাল : সুষমাময়ী স্মৃতি পুরস্কার।

চ—বিভাগ (১৩ - ১৫ বৎসর)

১ম—রীতেশ শর্মা : ব্রহ্মানন্দ সেন স্মৃতি পদক।

২য়—তথাগত চক্রবর্তী : মমতা সরকার স্মৃতি পুরস্কার।

৩য়—বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও অরিন্দম দাস : স্বর্ণলতা সরকার স্মৃতি পুরস্কার।

Concluding Lessons from the Bhagvadgita

by

Dr. A. K. Bandyopadhyay

The concluding Chapter of the Bhagvadgita (Chap. XVIII) refers to Arjuna's query about 'Sannyasa' (Asceticism) or Sankhya-yoga i.e. Yoga of knowledge or 'Jnana' and 'Tyaga' Yoga (including Karmayoga) or the Yoga of Desireless action. 'Tyaga' or relinquishment is declared to be of three kinds. Through sacrifice, gift, and penance wise men may purify the heart. All these acts of sacrifice, gift and penance, among other duties, should be performed giving up attachment and fruit of action. It is not that renunciation of action means inaction or idleness. Renunciation is giving up expectation of results of action. It is only through ignorance that we want to remain idle or inactive. This would be 'Tamasic'. Similarly, forsaking one's duty for fear of bodily stress or discomfort is not acceptable because it is 'Rajasic' form of relinquishment. We should follow 'Sattvic' form of relinquishment. We should act, according to the Scriptures, as duty and give up attachment to fruits of action. A wise man of true renunciation neither hates action nor is attached to it and this is conducive to goodness. For none it is possible to renounce completely. Fruits of action are generally good, evil and mixed for who have not renounced the fruits. Through detachment from the fruits of action we can eradicate all 'Karma' and its effects. Man performs action by his body, speech and mind. Incentive to action comes from knowledge, the objective of knowledge and the knower. There can be 'Sattvic', 'Rajasic' character for different kinds of knowledge, which lead to action. Action without passion or prejudice, action involving much strain, and action undertaken through ignorance should be avoided. True 'Sattvic' action is done freed from attachment, without any sense of ego and with firmness and vigour and unaffected by success or failure. Doer of Rajasic action is passionate and greedy and fruit for actton is sought for. When we act without self-control and piety and indulge in vulgarity, arrogance, deceit etc, our actions are 'Tamasic'. We should develop knowledge of right action and right cessation of action—which must be done and what ought to be done and the distinction between fear and fearlessness, and bondage and liberation. Reasoning can also be Rajasic, Tamasic and Sattvic. When we seek the fruits of action they can also be Rajasic or Tamasic or Sattvic. Our joys through accomplishments can also be Rajasic or Tamasic. Brahmanas, Vaishyas and Sudras have also their fields of activities demarcated. Our highest perfections come in the form of God-realisation, by working properly in the domains of activities. By

doing our duties we attain perfection. Better is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well-executed. We do not incur sin when we perform the duties enjoined by our nature. We should never abandon our duty. Through unattached mind, self-control and without having any thirst for enjoyment and going through the Path of knowledge we can attain freedom from the bondage of 'Karma' and highest perfection of God-realisation, by working properly in our domains of activities. By doing our duties we attain perfection. Through pure reasoning, regulating of food and being in a lonely place we can try to become one with the Eternal i.e. God. With our mind fixed on God, we should be able to get over all difficulties through His Grace. God dwells in the hearts of all beings. Surrendering all work to Him we should take refuge in Him i.e. God only. Listening to Bhagwan Srikrishna Arjuna said that he would carry out Bhagwan's bidding. He was told to surrender all duties to God and seek refuge in Him only. He knew that God dwelt in the hearts of all beings; and it is better to do one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another person well-executed. Through performance of one's duty well, a man attains perfection. A man should see the imperishable unity in all beings. God dwells in the hearts of all beings and we should seek refuge in Him with all our being. We should surrender all duties to God and seek refuge in Him alone and then we should get absolved of all our sins.

The Gita talks of 'Dharma' and 'Adharma', 'Tyaga' and 'Sanyasa' and 'Gunas'—they have distinctive meanings, 'Tyaga' is abadonment or giving up and renunciation stands for 'Sanyasa'. Both these can never be practised without abadonment. For perfection we are required to give up certain 'tendencies', urges, impulses and motives—we should give up all anxieties for enjoying the fruits of action. Desire and agitation bring about restlessness and dissipation of energies. 'Tyaga' is the means to reach the goal of renunciation of 'Sannyasa'. There can be three types of knowledge, action and actors subject to 'Gunas'and the attainmentof 'Guna' should be overcone through 'Sattvic' Guna which is pure and not harmful. But still they may create 'attachment' which should not be allowed to pre - dominate. We should understand the difference between 'Dharma' (Righteousness) and 'Adharma' (unrighteousness') and steer clear of the latter so that our mind, thought and deed remain pure without being diluted.

কেওড়াতলা - মহাশ্মশান

কবিরত্ন **শ্রীসুধীর গুপ্ত**

—১— কেওড়াতলার আদিম শ্মশানে
দেহ - দাহ - শেষে মুক্ত - পরাণে
পর-লোকে যায় চলি'
নিখর্ব জন ত্যাজি' মোহ - মায়া,
সাদরে লালিত - পালিত যে-কায়া
বর্জিয়া কুতূহলী
হ'য়ে শূন্যেতে চিরাশ্রয় পেতে,
লীলাময় সাথে শুভ - মিলনেতে
দানিয়া প্রেমাঞ্জলি।

—২— এই রীতি - নীতি মানি' চিরকাল
জীবন - মরণ - সাথে রাখি' তাল
চির - যাতায়াতই চলে,
যোগাযোগ যত গড়িয়া ওঠেই
আনন্দময় এই গতিতেই
অম্বরে - মহীতলে,
সবই ঘ'টে যায় অমেয় লীলায়,
প্রীতি - স্মৃতিময় সবে রয় তায়
চিরকাল কুতূহলে।

—৩— অমেয় -- অজানা - অচেনা সবই যে
লীলাময় - লীলা বিচিত্র কী যে।
অবোধ্য চিরদিন,
স্বাধীন সতত কল্পনা রয়—
তবু-ও বিরাজে চির - বিস্ময়—
কৌতুক-ও সীমাহীন
জাগে নিয়তই মরমী - মরমে
পরম প্রেমের-ই অতুল ধরমে—
এ প্রীতি যে অমলিন।

—৪— দিব্য প্রীতির - স্মৃতির বলয়
অজানিত - ভাবে গঠিত-ই হয়—
সমুদয় সুধা - ভরা,
অরূপ - রূপের অপরূপ লীলা—
সবই যে মূলে-ই চির - অনাবিলা—
রিপু - জাত - মোহ - হরা---
ধরা - অধরার যত লীলা - সব
বুঝিতে গেলেই লাগে অভিনব---
চলে সদা ভাঙা - গড়া।

—৫— গাঙের জলের মত গতিশীল
জ্যোতিষ্ক - ভরা সচল নিখিল—
অস্থিরই চরাচর,
সব-ই গতিশীল—স্থিতিশীল-ই নয়--
স্থিতিশীল শুধু চির - অদ্বয়—
শ্মশানই যে মনোহর,
পুড়িয়া চিতায় ভস্ম যে হয়
চিরদিন ধরি' প্রাণী সমুদয়,
জাগে শ্মশানেশ্বর—
বিভূতি - ভূষণ শিব সনাতন—
চির - লীলাময় নট অতুলন
ভুলায় দ্বৈত - ডর।
লীলা বুঝিয়াই ধ্যানী - যোগীগণ
বলে উল্লাসে -- সব-ই যে মোহন—
প্রাণারাম-ই সুন্দর।

ভোরের স্বপ্ন

অরুণ মুখোপাধ্যায়

ভোর রাতে স্বপ্ন শিশির ভেজা
কি অপূর্ব মিষ্টি গন্ধ ভরা
সংগীত বাড়ছে রিম্‌ঝিম্‌
বসে আছে ধ্যান নিমগ্ন মন
তমসো মা জ্যোতির্গময়—

একী অনৈসর্গিক দৃশ্যপট
ভেসে আসছে আলোক কণিকা বিন্দু
উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোক বৃত্ত রেখ
একী স্বপ্ন না এ অলৌকিক—
আপ্লুত চিত্তে বলে উঠি নিয়ে চল
শান্তি মৌন অবলোকিতেশ্বর !

দাও গো তাহলে একটা মন্ত্র দাও
দুঃখ কষ্ট জ্বর জ্বালা দূর কর, করগো অমৃতময়।
দাওগো তাহলে অখণ্ড শক্তি দাও
অশক্ত দেহে ছুটে চলার গতি।
অশক্তি কে দূর করে, হে মহিমাময়।
দাও বুক ভরে অনন্ত অপার আশা
নিরাশার বুকে সব সুখ জাগানিয়া
দুরাশাকে ঠেলে ফেলবে পাহাড় চূড়ায়
নিরালা আকাশে করগো দ্যুতিময়।
ওই প্রশান্ত আলোকবৃত্তে সুস্মিত গম্ভীর
গুঞ্জিত গীত শুনি সুধাময় সুমধুর—
আমাকে তাহলে ধ্যানের আলোক দাও॥

বেভুল !

শ্রীঅগ্নিমিত্র চৌধুরী

প্রেমমুগ্ধ ছাঁদ খুঁজে
অভিমানী এ মর্ত্য জীবন
অস্থিময় স্বেদরক্তে গুঁজে
দু'হাত মস্তিতে যায় মজে !

আবিশ্ব প্রপঞ্চে মন
অকস্মাৎ এলে বেলে সাজে !
খোলা জলে কুলকুল কুটিল জীবন !!
উপদ্রব যায় শুধু বেজে॥

দশ মহাবিদ্যা ও আমি

ডঃ অভিনব গুপ্ত

দশ দিকে দশ মহাবিদ্যা আছেন আমায় ঘিরে;
মায়ের সনে আমার খেলা কাল-বারিধির তীরে।

নানান মতে সাধক পূজে নানান ভাবনায়,
নিজেকে নিবিষ্ট রাখে কঠোর সাধনায়।
পথের নিদেশ না পাই খুঁজে পড়ি দোটানায় !
সকল পথই হয় দেখি শেষ মায়ের মন্দিরে।

মা দিয়েছে চোখ বেঁধে মোর কানামাছি খেলায়।
ভেবেছিলেম, ধরবো মা-কে অনায়াসে হেলায়।
কিন্তু ঘুরে ঘুরেই মরি মা-কে খোঁজার ঠেলায় !
সাধন - ভজন-জপ আরাধনা সয় না আমার ধাতে;
থাক্ না সে সব গুহ্য ব্যাপার সাধকেরই খাতে।
মায়ের সাথে লীলা খেলার কী এসে যায় তাতে ?
খেলা শেষে মা তাঁর কোলে জানি নেবেন ফিরে।

জন্মাষ্টমী

শ্রীমতী যূথিকা সিন্‌হা
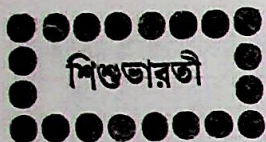
নিখিল জগত যবে ঘুমে অচেতন
আঁধার বিদারী এলে
তুমি নারায়ণ॥
অষ্টমী তিথি ছিলো
রোহিনী নক্ষত্র
আসিতে মরতে হলো
ধরণী পবিত্র॥
হেনকালে দৈববাণী
হল আচম্বিতে
"পুত্রেরে রাখিয়া এস
নন্দের গৃহেতে॥
সেথায় দেখিবে গিয়া
যশোদা জননী
জনম দিয়াছে কন্যা
রূপের লাবণী॥
পুত্রেরে রাখিয়া সেথা
কন্যাটিরে লয়ে
ফিরিয়া আসিবে তুমি
আপন আলয়ে॥"
বসুদেব কোলে করে
কত যতনে
সাবধানে চলিলেন
নন্দের ভবনে॥
তখন প্রবল বারি
ঝর ঝর ঝরে
বাসুকী মাথায় তব
ফনা ছত্র ধরে॥
বাসুদেব চলিলেন হাঁটিতে হাঁটিতে
যমুনা হলেন পার
ত্বরান্বিত চিতে॥
নন্দের ভবনে গিয়া
কৃষ্ণেরে রাখিয়া
যশোদার কন্যাটিরে
কোলেতে লইয়া
দ্রুতগতি ফিরিলেন
নিজ কারাগারে
কন্যারে তুলিয়া দেন
দেবকীর করে॥
যেমনি তখন কন্যা
কাঁদিতে লাগিল
ঘুমন্ত প্রহরী যত
জাগিয়া উঠিল॥
সংবাদ জানাতে যায়
কংসের সকাশে
ক্ষিপ্রমতি হয়ে কংস
ছুটে চলে আসে॥
কন্যাটিরে বধিতে গিয়া
চমকি উঠিল
দুর্গারূপে দেখা দিয়ে
এ কথা বলিল॥
"তোমারে মারিবে যেবা
গোকুলে বাড়িছে"
একথা শুনিয়া কংস
ক্রোধেতে কাঁপিছে॥
যুগে যুগে এস প্রভু
পতিত পাবন
পাপীজনে উদ্ধারিতে
তুমি নারায়ণ॥
ভকতি কুসুম দিয়ে
পূজি ও চরণ
পার করে দিও মোরে
শ্রীমধুসূদন॥

বৃক্ষ ধর্ম জাতক

জাতকের গল্প— ৭৪

শ্রীমতী সাধনাসুধা বড়ুয়া

একদা রোহিনী নদীর জল নিয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে চরম বিবাদ শুরু হোল। এই কথা শ্রবণ করে তথাগত এই কথা বলেছিলেন। তিনি এই কলহের কথা জানতে পেরে আকাশ পথে রোহিনী নদীর ঊর্ধ্বদেশে উপবেশন করেন। তখন তাঁর দেহ থেকে নীলাভ রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তাই দেখে কলহরত ব্যক্তিরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লো। এরপর তিনি আকাশ থেকে নীচে নেমে নদীতীরে আসন গ্রহণ করলেন এবং কলহ উপলক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন।

তথাগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে বললেন—"মহারাজগণ, আপনারা কলহ ত্যাগ করুন। নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলাই কর্ত্তব্য। একতা থাকলে শত্রুরাও আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের কথা থাক, চেতনাহীন বৃক্ষদের মধ্যেও একতা থাকা আবশ্যক। অনেকদিন আগে হিমালয়ের এক শালবনে প্রবল ঝড় হয়েছিলো। কিন্তু বৃক্ষ, গুচ্ছ গুল্ম, লতা পরস্পর ধরাধরি করে ছিল বলেই ঝড় তাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল, তথাপি একটি বৃক্ষকেও পাতিত করতে পারেনি। ঐ জঙ্গলেই বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটি মহাবৃক্ষ ছিলো। ঐ বৃক্ষ অন্য কোন বৃক্ষের সঙ্গে একতা রক্ষা করে চলেনি। সে একাই থাকতো। যার ফলে ঐ প্রচণ্ড ঝড়ে উন্মূলিত ও ভূপাতিত হয়েছিল। অতএব আপনাদের কর্ত্তব্য পরস্পর মিলে মিশে থাকা।" তার পর জ্ঞাতিদের অনুরোধে তথাগত সেই অতীত কথা বলতে আরম্ভ করলেন :—

বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে প্রথম বৈশ্রবণের মৃত্যু হলে তাঁর রাজ্য ভার তাঁর শক্র অপর এক বৈশ্রবণকে দেওয়া হয়। নূতন বৈশ্রবণ রাজ্য ভার গ্রহণ করে তরু গুচ্ছ লতা গুল্ম বাসিনী দেবতাদের বললেন—তোমরা নিজেদের মনোমত স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে বাস করো।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের পাদদেশে এক শালবনে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদের পরামর্শ দিলেন—যখন বাসা বানাবে তখন এই শালবনেই তৈরী করো। আমার চার পাশেই তোমরা থাকো। বৃক্ষদেবতাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তারা বোধিসত্ত্বের কথা মতো কাজ করলো। কিন্তু যারা নির্ব্বোধ তারা ভাবলো—আমরা বনে বাস করবো কেন? লোকালয়ে থাকলে অনেক সুবিধা। সেখানে ভক্তদের কাছে কত উপহার পাওয়া যায়। এই ভেবে তারা লোকালয়ের কাছে শাল বৃক্ষে বাস করতে লাগলো।

ঘটনাক্রমে সেই দিনই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। প্রাচীন বৃক্ষগুলি দৃঢ়মূল এবং শাখা প্রশাখা সমন্বিত ছিল বটে, কিন্তু তারা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ সহ্য করতে পারলো না। বায়ুবেগে গাছের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সমূলে উৎপাটিত হ'লো। কিন্তু এই ঝটিকা যখন পরস্পর সম্বন্ধ ঘনশাল বৃক্ষের বনে গিয়ে পড়লো তখন পুনঃ পুনঃ আঘাত করা সত্ত্বেও একটি বৃক্ষেরও কোন অনিষ্ট করতে পারলো না।

নির্ব্বোধ দেবগণ বাসা থেকে নিরাশ্রয় হয়ে পুত্রকন্যাদি সহ পুনরার হিমালয়ে গমণ করলেন এবং সেখানকার শালবন বাসিনী দেবতাদের কাছে আপনাদের দুঃখের কাহিনী জানালেন। বোধিসত্ত্ব সব শুনে বললেন—"আমার সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করাতেই এইরূপ দুর্দশা ঘটেছে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করে ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন :—

বন মাঝে তরুরাজি পরস্পরে আলিঙ্গিয়া ভয় নাহি
করে প্রভঞ্জনে,
একাকী থাকে যে বৃক্ষ, নিস্তার তাহার কিন্তু
অসম্ভব হেরি সর্বক্ষণে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, মিলিয়া মিশিয়া থাকি
শত্রু ভয়ে ভীত কভু নয়,
কিন্তু যবে বুদ্ধিদোষে কলহ আসিয়া পশে,
ফল তার ধ্রুব কুলক্ষয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়ছিলেন। তারপর জীবনাবসানে তিনি কর্মানুরূপ ফলভোগ করার জন্য লোকান্তরে প্রবেশ করেন।

বৈশ্রবণ—বিশ্রবা মুনির পুত্র কুবের। বৌদ্ধমতে দেবতারাও মরণশীল। এক দেবতার প্রাণ বিয়োগের পর অপর একজন তাঁর নাম গ্রহণ করে তৎপদে অভিষিক্ত হ'ন।

হারানো সাথী

বিগত দিবসে আমরা যাঁদের হারিয়েছি—

১৬-৮-২০০৮ অনিল চন্দ্র দত্ত ('সঙ্ঘসাথী'র লেখক)

৩০-৮-২০০৮ নিলীমা রায় চৌধুরী

এঁদের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁদের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবার পরম ভক্ত অজিত কুমার ভদ্র বিগত ২৪শে জুলাই, ২০০৮ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে স্বগৃহে সজ্ঞানে তারাচরণলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর।

ভক্তিসিন্ধু যতীন্দ্রলাল ভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত কুমার ভদ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে। বালীগঞ্জের জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে ১৯৪৬ সালে Matric পাশ করেন এবং ১৯৪৮ সালে I. Sc. করিবার পর চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পুনরায় একটি Private Firm এ কর্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তথায় কর্মরত ছিলেন।

তাঁহার পিতৃদেব শ্রীশ্রীসাধুবাবার পরম ভক্ত ছিলেন। সুতরাং জন্মসূত্রেই তিনি শ্রীশ্রীসাধুবাবার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীশ্রীসাধুমায়েরও পরম ভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণনগর, কালনা, আগরপাড়া, শিমূলতলা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীসাধুবাবার উৎসবে যোগদান করিতেন। কলিকাতা শ্রীতারামঠেও তিনি নিয়মিত উৎসবাদিতে যোগদান করিতেন। শ্রীশ্রীসাধুবাবার আশীর্বাদ স্বরূপ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে 'সঙ্ঘসেবক' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়।

চাকুরীরত অবস্থায় তিনি হোমিওপ্যাথি D. M. S. পাশ করেন। তিনি তারাচরণ সত্যসঙ্ঘের দাতব্য চিকিৎসালয় সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন। কিছুদিন উক্ত চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকরূপেও কাজ করিয়াছেন।

সদাহাস্যময়, অমায়িক, পরোপকারী, আত্মীয় স্বজন নির্বিশেষে সর্বজনপ্রিয় অজিত কুমার ভদ্রের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

মঠের সংবাদ

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন—গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮ শুক্রবার তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিবসে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তাহার পর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সহিত নৃত্য পরিবেশন করে।

তাহার পর Talking Doll এর কথা বলা এবং ম্যাজিক প্রদর্শন দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করা হয়। সবশেষে প্রথমে ছোটদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। পরে বড়দেরও একইভাবে আপ্যায়ন করা হয়। গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও রোটারী ক্লাব স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনায় এবং ছোট ও বড়দের আপ্যায়নে সহযোগিতা করিয়াছেন। সেজন্য তাহাদের ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীশ্রীসাধুমায়ের তিরোধান তিথিপূজা—বিগত ৬ই ভাদ্র, ১৪১৫ (ইং ২৩শে আগষ্ট, ২০০৮) শনিবার পরমারাধ্যা সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর ৪৩তম তিরোধান তিথিপূজা যথাযোগ্য আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবসে আশ্রম প্রাঙ্গণে পূজা, পাঠ, আরাত্রিক ও হোম এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে ভক্তগণ কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সর্বশ্রীমতী আরতি বসু, ইন্দিরা রায় চৌধুরী, অরুণা দত্ত, গোপা সেন, জয়শ্রী মুখার্জী, গোপা গুপ্ত এবং শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে দুর্গানাম কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শ্যামলী মুখার্জী, শ্রীমতী শ্রীময়ী ভট্টাচার্য ও তাঁহার ভগিনীত্রয়ী। সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীপার্থ সারথী দাস। সবশেষে দুর্গানাম কীর্তনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। দুর্গানাম কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

রবিবাসরীয় সভা :—

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ তারিখে।

৬-১-২০০৮ : বিষয়—"মাইকেল মধুসূদন"। সভাপতি—শ্রীরামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত ও শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৩-১-২০০৮ : বিষয়—"স্বামী বিবেকানন্দ"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২০-১-২০০৮ : বিষয়—"ক্ষমা"। সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুনীল রাহা। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত। শ্রীসুনীল রাহা, শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বনাথ

সেন। বক্তা—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৭-১-২০০৮ : বিষয়—"নেতাজী সুভাষচন্দ্র"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী ও শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা—শ্রীসুনীল রাহা। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ তারিখে।

৩-২-২০০৮ : বিষয়—"সন্তোষ পরম ধন"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীদেবশ্রী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১০-২-২০০৮ : বিষয়—"বিশ্বাস"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—শ্রীসুনীল রাহা। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

১৭-২-২০০৮ : বিষয়—"বিদ্যা"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীউত্তম অধিকারী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৪-২-২০০৮ : বিষয়—"বিদ্যাসাগর"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীশিমূল ঘোষ, শ্রীমতী মাধুরী সুধা চৌধুরী ও শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের

ও

সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সরসীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিত

নিবেদক

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ

দূরভাষ :—

২৬৩৪৯৯৮৯, ৯৮১০১২৪৮৪১, ৯৮৯১৭২২৯১১, ৯৮১১০৯০৬৮৭

আমরা সর্বদাই আমার ও তোমার বলে থাকি। কিন্তু আমার "আ" তোমার "তো" বাদ দিলে বাকি থাকে "মা'র," বাস্তবিক সমস্ত জগতটাই মা'র, এই ভাব মনে আনলে অহংকার আর থাকে না।

—শ্রীতারাচরণ

15th SEPTEMBER—2008 REGISTERED SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-190/2007-09
সঙ্ঘসাথী ভাদ্র ১৪১৫ R. N. I. No. 2677/57

ভাবসিন্ধু ৺নির্ম্মল চন্দ্র বড়ুয়া রচিত—

১। সাধনার আলো (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
২। শ্রীশ্রীমা অরণ্যকুমারী (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
৩। অমৃত পরশ ৫ টাকা
৪। স্মরণ ৪ টাকা
৫। শ্রীপদ ছায়ায় ২০ টাকা
৬। প্রাণের ঠাকুর ২২ টাকা
৭। চিরসাথী হে অমৃতময় ১২ টাকা
৮। শ্রীশ্রীতারাচরণ কাব্যসম্ভার (আদি পর্ব) ১০ টাকা
৯। ঐ (মধ্য পর্ব) ১৬ টাকা
১০। স্মৃতির আলোয় সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ২০ টাকা
১১। The Message of Sri Sri Sadhubaba Taracharan Paramahansa ১ টাকা
১২। অমোঘ আহ্বান ৫ টাকা

শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

R. R. BANERJEA, B.Sc.
Sri Sri Sadhu Taracharan Paramahansadev— Rs. 10.00

প্রেমনিধি ৺উপেন্দ্রনাথ ঘটক রচিত—

শ্রীশ্রীমাতাজীর তীর্থ ভ্রমণ ৫.০০

৺অনিলবরণ চৌধুরী রচিত—

১। সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস (৩য় সং) ১৫.০০
২। সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ৫.০০
৩। শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (গীতি আলেখ্য) ২.০০
৪। তুষারতীর্থে (২য় সং) ১০.০০

৺বীরেন্দ্র নাথ ঘটক রচিত—

অমৃত লহরী (১ম খণ্ড) ৪.০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৩.৫০

ব্রহ্মানন্দ ৺ব্রহ্মনাথ সুর রচিত—

দেব-সন্নিধানে (২য় সং) ১৫.০০

৺ব্রজেন্দ্র লাল কানুনগো প্রণীত—

সাধু তারাচরণ (২য় সং) ৫.০০

৺যামিনীকান্ত সেন প্রণীত—

সদ্গীতা (২য় সংস্করণ) ৫.০০

৺শচীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত—

সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী (দ্বিতীয় সং) ২.০০

৺কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—

রত্নাবলী (২য় সংস্করণ) ১০.০০

শ্রীসুনীল রাহা রচিত—

সবার মা সাধুমা ১০.০০

Late DR. DINESH CHANDRA SEN, D.Sc., P.R.S.
Sadhubaba Sri Sri Taracharan Paramhansadev & Sadhuma Sri Sri Aranya Kumari Devi— Voluntary Donation Rs. 8/-

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (হিন্দী)—শ্রীজয়দেব নারায়ণ সাহী মূল্য—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীতারামঠ, ৬৫, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তারাচরণ সভ্যসঙ্ঘের পক্ষে 'সঙ্ঘসাথী মুদ্রণ', ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সঙ্ঘসাথী কার্য্যালয় : ৬৫, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ Tel. No.2464-2099
Mob : No. 9748955894